বাংলাপিডিএফ
সাপুড়ে সর্দার
নাবিক দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
দস্যু বনহুর
২৯-৩০
দুই খন্ড একত্রে
রনি

সাপুড়ে সর্দার-২৯
নাবিক দস্যু বনহুর-৩০

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

বোরখার নীচে মনিরার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। স্বামীর হাসির শব্দ তার কানে যেন মধু বর্ষণ করলো। যার সন্ধানে সে পাগলিনী প্রায় যার জন্য সে নিজের প্রাণ বিনষ্ট করতেও দ্বিধা বোধ করতো না, সেই আরাধ্যজন তার সম্মুখে দন্ডায়মান। মুহূর্তে ভয়-ভীতি সব উবে গেলো তার কিন্তু সে নিশ্চুপ রইলো, মুখের আবরণ সে উন্মোচন করলো না।

বনহুর এবার মনিরাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো—এবার তোমার মুক্তি নেই বান্ধবী। তুমি জানো দস্যু বনহুরের হাতে যে পড়ে তার নিস্তার নেই।

বললো মনিরা—কি চাও তুমি?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—তোমার সর্বস্ব আমি লুটে নেবো।

এতো বড় সাহস তোমার?

জানি আজ তোমার হাতে রিভলভার নেই।

তাই তোমার এতো স্পর্দ্ধা----

হাঁ, আজ তোমাকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে কেউ উদ্ধার করতে সক্ষম হবে না। পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরীও না।

না না, আমাকে ছেড়ে দাও। স্বামীর হাত কামড়ে দিয়ে বলে মনিরা।

রক্ত বের করে দাও তবু ছাড়বো না। বনহুর আরও নিবিড় করে মনিরাকে আকর্ষণ করে।

মনিরা কামড়ে দিলেও চাপ দিতে পারে না।

হাসে বনহুর, মনিরার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে—মনিরা, আমার সঙ্গে তোমার এ আত্মগোপনতা কেন?

মনিরা সঙ্গে সঙ্গে নিজের মুখের আবরণ উন্মোচন করে তাকায় স্বামীর মুখের দিকে—তুমি আমাকে চিনেছিলে?

হাঁ, তুমিও যেমন আমার সঙ্গে ছলনা করে বান্ধবী সেজে আমাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছিলে, আমিও তাই তোমাকে---

মনিরা স্বামীর মুখ থেকে শিখের দাড়ি-গোঁফ খুলে রাখে। ব্যথা-করুণ কণ্ঠে বলে —তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বনহুর মনিরার দেহের বোরখাটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে, তারপর ওকে বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে।

স্বামীর প্রশস্ত বক্ষে মনিরা নিজকে বিলিয়ে দেয়। আজ মনিরার মনে অফুরন্ত আনন্দ উৎস, সমস্ত অন্তর জুড়ে এক আবেগময় অনুভূতি!

মনিরা ভাবতে পারেনি, আজ তার ভাগ্য এতো প্রসন্ন হবে! ভয়ঙ্কর এক বিপদের মধ্য দিয়ে আসবে পরম মধুময় মুহূর্ত। খুশির উচ্ছ্বাসে সে স্বামীর বাহুবন্ধনে নিজকে অর্পণ করলো। অনাবিল পাওয়ার আনন্দে বুক তার স্ফীত হয়ে উঠেছে।

মনিরার দক্ষিণ হাতখানা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরলো। ভাববিহ্বল মনিরার চোখ দুটি মুদে এলো আপনা আপনি। বললো মনিরা— বড় দুষ্ট তুমি!

উঁ হুঁ মোটেই না, মনিরার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে বনহুর।

সত্যি, বেশি রাতে ফিরে গেলে বাংলোর ওরা কি ভাববে বলতো?

তুমি তো জানোই দস্যু বনহুরের কবলে পড়লে তার নিস্তার নেই। কাজেই ফিরে যাওয়া যত সহজ মনে করেছো তত সহজ নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠে।

বনহুর মোম জ্বেলে দেয়।

মনিরা বলে—এই নির্জন পোড়োবাড়িতে কি করে থাকো তুমি?

কেন?

ভয় করে না তোমার?

হেসে উঠে বনহুর—ভয়! মনিরা, তোমার স্বামীই যে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ভয়।

ভূতের ভয় করে না তোমার?

কি বললে মনিরা—ভূতের ভয়। হাঃ হাঃ হাঃ ভূত আমাকে দেখলে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়, বুঝলে?

সত্যি তুমি যে কি!

আজও তুমি আমাকে চিনলে না মনিরা।

চিনি বলেই অবাক হই তোমার কান্ডকলাপ দেখে। বলতো কেন তুমি আমাদের কাউকে কিছু না বলে অমন করে পালিয়ে এসেছো এই ভারতবর্ষে?

আমার সে কাহিনী অদ্ভুত রহস্যময়। কিন্তু তুমি কি করে পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরীর আত্মীয় হলে তা তো বললে না?

বলবো, সে আর এমন কোনো রহস্যপূর্ণ কথা নয়। তুমি তো ডুব মেরেছো আমি কাকে নিয়ে কাটাই বলো?

কেন, তোমার মামীমা—তোমার নূর?

তারা তো আছেই কিন্তু নিষ্ঠুর তুমি জানো না, স্বামী যার ঘরে নেই, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর কেউ নেই।

তাই স্বামীর অভাব পূরণ করবার জন্য---

না, স্বামীর অভাব পূরণ করবার জন্য নয়, স্বামীর সন্ধানে আমার মন আমাকে টেনে এনেছে। সত্যি আমি মাসুমার কাছে চিরঋণী। ওকে আমি ধন্যবাদ দেই, ওর জেদেই আমি এসেছিলাম। তাই আজ তোমায় পেলাম। স্বামীর বুকে মাথা রাখে মনিরা।

বনহুর বলে —মা কেমন আছে মনিরা?

ভাল আছেন তিনি, তবে তোমার জন্য পাগলিনী প্রায়।

নূর কত বড় হয়েছে?

অনেক বড় হয়েছে। তোমার কথা বলে সব সময়ে মন খারাপ করে সে।

পড়াশোনা করছে তো?

হুঁ।

লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হোক মনিরা। আমি যা পারিনি নূর তাই করবে। মনিরা ওর সম্মুখে যাবার ইচ্ছা আর আমার নেই।

এ তুমি কি বলছো?

হাঁ, সত্যিকথা বলছি। যদি যাই, রাতের অন্ধকারেই ওকে দেখে আসবো কিন্তু পিতা বলে কোনোদিন আমি তার সাক্ষাতে গিয়ে দাঁড়াবো না।

কি নিষ্ঠুর পাষন্ড তুমি!

মনিরা আমি কত বড় অভিশপ্ত মানুষ তা তো জানো। কোন্ মুখ নিয়ে আমি নূরের সরল-সহজ প্রাণের সম্মুখে নিজকে তুলে ধরবো? কোন্ মন নিয়ে--বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠ।

মনিরা স্বামীর মাথায়-কপালে হাত বুলিয়ে দেয়। আঁচল দিয়ে মুছে দেয় চোখের পানি। মনিরার চোখদুটোও শুষ্ক ছিলো না।

রাত বেড়ে আসে। মনিরা বলে— চলো এবার আমাকে রেখে আসবে?

মনিরা! বনহুর নিবিড়ভাবে মনিরাকে আবার বুকে জাপটে ধরে—চলে যাবে?

না গিয়ে কোনো উপায় আছে বলো? স্বামীর গলায় -বুকে হাত দিয়ে অনুভব করে মনিরা। গন্ডের সঙ্গে গন্ড মিলিয়ে বলে—আবার আসবো।

আসবে?

হাঁ যখন তুমি বলবে তখনই আমি আসবো তোমার পাশে।

চলো মনিরা রেখে আসি এবার তোমায়।

চলো! মনিরা উঠে দাঁড়ায়।

বনহুর আর মনিরা গাড়ীতে এসে বসে। এবার মনিরা ড্রাইভ আসনের পাশে বসে, স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে গিয়ে অনাবিল এক শান্তিতে ভরে উঠে ওর মন। এ যে জীবনের এক পরম শান্তি!

বাংলোয় ফিরবার পূর্বে মনিরাসহ বনহুর দিল্লীর এক দোকানে গিয়ে অনেক কিছু কিনে ফেললো। মাসুমার জন্য কিনলো শাড়ী ব্লাউজ, হাশেম চৌধুরীর জন্য নতুন নাইট্ ড্রেস আর খাবার নিলো বেশ কিছু।

এবার বনহুর শিখ ড্রাইভারের বেশে সজ্জিত হয়ে নিলো। ড্রাইভার সেজে গাড়ী চালাচ্ছে বনহুর আর মনিরা পিছনের আসনে বসে আছে। বাংলোয় ফিরতেই শশব্যস্তে ছুটে এলেন হাশেম চৌধুরী আর মাসুমা, এতো বিলম্ব দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো ওরা।

হাশেম চৌধুরী ড্রাইভারকে ধমক দিলেন—শিবাজী, এত্না দের কিয়াতুম্ লোক? কাঁহা গিয়া থা বোলো?

হাম্ কেয়া কসুর কিয়া হুজুর। মেম সাহাব তো দোকান পর এত্ না দেড় কিয়া।

মনিরা গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামাতে নামাতে বললো—হঠাৎ এসব দেখে না নিয়ে আর পারলাম না।

অতো সব কি এনেছিস মনিরা? বললো মাসুমা।

সব দেখবি চল্। বললো মনিরা।

হাশেম চৌধুরী বললেন ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে—শিবাজী এসব অন্দর মে লে চলো।

বহুৎ আচ্ছা হুজুর, আপ্ লোক চলিয়ে আভি হাম্ লে আতা।

আচ্ছা লে আও। চলো তোমরা চলো। অগ্রসর হলেন হাশেম চৌধুরী।

মনিরা বললো—এখন শরীর কেমন আছে মাসুমা?

তোর চিন্তায় অসুখ পালিয়ে গেছে কোথায় কে জানে।

বাঃ তাহলে তো ভালই হয়েছে। আমার চিন্তায় যদি অসুখ পালায় তাহলে অসুখের দামটা না হয় আমায় দিস।

মাসুমা বলে—বেশ তাই দেবো। কিন্তু এতো দেরী করলি কোথায় বলতো?

ঐ তো বললাম দোকানে।

এতো সব কি কিনেছিস্ মনিরা? মামীমা টাকাগুলো দিয়েছিলেন, সব বুঝি শেষ করে এসেছিস্ না?

না না, তেমন কি আর এনেছি।

চল্ আগে দেখি তারপর মজাটা দেখাবো। আচ্ছা বল্ রঞ্জন বাবুর কোনো সন্ধান পেলি কিনা?

আমি কি ওকে খুঁজতে গিয়েছিলাম তাই পাবো?

জিনিসপত্র দেখে তো হাশেম চৌধুরী আর মাসুমার চক্ষুস্থির। সেকি মূল্যবান জামা-কাপড় অনেক দামী দামী ফলমূল আর কতরকম খাবার!

মাসুমা তো গালে হাত দিয়ে বসলো—সর্বনাশ, এসব তুই কি করেছিস বল্ তো?

আগে বল্ পছন্দ হয়েছে কিনা?

কি যে বলিস্ এতো দামী জামা-কাপড় আর এসব পছন্দ হবে না?

হাশেম চৌধুরীও বিস্ময়ভরা গলায় বললেন—আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এসব কেন আনতে গিয়েছিলেন বলেন তো?

কোনোদিন কিছু দেইনি আপনাদের তাই এই সামান্য কিছু।

এ সব সামান্য? বললেন হাশেম চৌধুরী।

এরপর থেকে মনিরা প্রায়ই শিবাজীসহ চলে যেতো বাইরে। হয়তো কোনো কাজের নাম করেই যেতো। কিন্তু বনহুর আর মনিরা মিলিত হতো সেই পোড়াবাড়িতে।

মনিরার জীবন আবার আনন্দে হাসি-গানে ভরে উঠলো। স্বামীসঙ্গ তার জীবনকে করে তুললো মুখর।

পোড়োবাড়ির নির্জনতায় মনিরা স্বামীকে একান্ত নিজের করে পেতো, সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতো স্বামীর অস্তিত্ব।

বনহুর যখন মনিরাকে নিয়ে আত্মহারা তখন সাপুড়ে পল্লীতে নূরী বনহুরের প্রতীক্ষায় অহরহ অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে। সেই যে তার গলার মালা দেখে আনমনা হয়ে গেলো, তারপর আর ওকে ধরে রাখতে পারলো না নূরী কিছুতেই। নূরী নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে লাগলো কেন সে ঐ মালা গলায় পরেছিলো। কেন সে ঐ মালা খুলে রাখেনি—ঐ মালার জন্যই বনহুর হয়তো কোথাও কোনো বিপদে জড়িয়ে পড়েছে।

নূরীর চোখের পানি বিচলিত করে তুললো কেশবকে।

সাপুড়ে সর্দার যখন জানলো নূরীর প্রিয়জন হলো ঐ বাবুজী তখন সেও কম ব্যথিত হলো না। নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো।

নিঃসন্তান সাপুড়ে সর্দার এই মেয়েটিকে যারপর নাই স্নেহের চোখে দেখতো। কেন যেন তার অত্যন্ত ভাল লাগতো ওকে। তাই নূরীর চোখের পানি তার অন্তরে দারুণ আঘাত করলো।

রংলাল কিন্তু সব সময়ে নূরীকে হস্তগত করার জন্য গোপনে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে।

একদিন নূরী একা একা বসে চিন্তা করছিলো হয়তো বনহুরের কথাই ভাবছিলো সে—এমন সময় হঠাৎ রংলাল এসে তার কাঁধে হাত রাখলো। চমকে ফিরে তাকালো নূরী, সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হলো ওর মুখমন্ডল।

রংলাল হেসে বললো—এতো করে কার কথা ভাবছিস্ ফুল?

নূরী ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস্ করে উঠলো—সেকথা তোমার শুনে কাজ নেই। যাও এখান থেকে।

যাবো আমি! হুঁম তোমাকে নিয়ে তবেই যাবো। রংলাল জাপ্‌টে ধরে ফেললো নূরীকে।

নূরী চীৎকার করে উঠলো—বাবাজী---বাবা --বাবা---

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সাপুড়ে সর্দার; হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো রংলালের উপর, টুটি টিপো ধরলো ওর।

রংলাল নূরীকে তখনকার মত ছেড়ে দিলো বটে কিন্তু সে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেলো।

নূরী সাপুড়ে সর্দারের বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ক্রন্দন ভরা কণ্ঠে বললো—বাবা, আমাকে রংলালের হাত থেকে বাঁচাও।

এমন সময় হঠাৎ আবির্ভাব হয় বনহুরের।

সাপুড়ে সর্দার খুশি হলো বনহুরকে দেখতে পেয়ে।

নূরী ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে।

সাপুড়ে সর্দার বললো—একটা কথা বলবো তোমাকে বাবু অত্যন্ত গোপন কথা। এদিকে এসো বাবু আজ সব কথা বলবো। হামার কোনো ছেলেমেয়ে নেই তাই তোমরা হামার ছেলেমেয়ে। বাবু হামি যখন খুব জোয়ান ছিলাম তখন এক দিন কাহাতুর নামে এক পাহাড়ে সাপ ধরিতে গিয়েছিলাম হামার বাপুজি ছিলো সাথে।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বললো—কাহাতুর পাহাড়?

হাঁ বাবুজী, কাহাতুর পাহাড় দিল্লীর শহর হইতে পাঁচশত মাইল দক্ষিণে। ওখানে যাইতে তিন মাস তের দিন সময় লাগে।

কেন? কোনো যানবাহন চলে না?

না বাবুজি পায়ে হাইটে যাইতে হয়। সেই কাহাতুর পাহাড়ে এক গুপ্তধনের গুহা আছে। বাবুজী, হামি সেই পথ জানি।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো আবার—গুপ্তধন।

হাঁ বাবুজী বহুৎ সোনা-দানা হীরা জহরৎ আছে সেই গুপ্ত গুহায়। হামার কোনো বেটা পুত্র নেই, এক ভাতিজা রংলাল—বাবুজী বড় নিমকহারাম উ লোক আছে। তাই হামি উহ্যকে এ রাস্তা দেখাইমু না।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শুনছে তার চোখের সম্মুখে ভাসছে এক সুড়ঙ্গ পথ, তারপর এক গুহা—গুহার মধ্যে অসংখ্য ধনরত্ন, মণি মানিক্য। বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, লোভ তার নিজের জন্য নয়—ওগুলো আনতে পারলে অনেক কাজে লাগবে।

বললো বনহুর—সর্দার, সত্যি বলছো?

হাঁ বাবুজী, হামি কোনোদিন মিথ্যা বলিবো না। বাবুজী, তুম্ হামার বেটা।

বেশ তাহলে তুমি রাজী আছো?

হাঁ রাজী আছি। বাবুজী হামি আর দেরী করিতে পারিবো না। দু'একদিন পর কাহ্তুর পাহাড়ে রওয়ানা দেব।

তাই হবে। বললো বনহুর।

সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে বনহুর চলে গেলো তার পোড়ো বাড়িটিতে। দূরদেশে পাড়ি জমাবার যা প্রয়োজন সব সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করে নিলো।

বিদায় দিনে বনহুর মনিরাকে নিয়ে এলো তার পোড়োবাড়িতে। আজ বনহুরকে বেশ গম্ভীর আর ভাবাপন্ন লাগছিলো।

মনিরার খুশির অন্ত নেই—স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো, বললো—আজ এত উদাস মনে হচ্ছে কেন তোমাকে বলতো?

মনিরার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো বনহুর—একটা কথা তোমাকে বলবো মনিরা, অমত করবে না তো?

চমকে উঠলো মনিরা সোজা হয়ে বসে বললো—তার মানে?

মনিরা, আমাকে কোনো এক ব্যাপারে দূরে যেতে হচ্ছে। হয়তো ফিরতে বিলম্ব হবে।

মনিরা অভিমান ভরে বললো— চলে যাবার পূর্বে আমাকে হত্যা করে যাও।

ছিঃ লক্ষ্মীটি জরুরী কাজ না হলে যেতাম না।

তা আমি জানি, সবই তোমার জরুরী কাজ। কবে তোমার অবসর হলো? জীবনে তুমি কোনোদিন অবসর হবে কিনা তাই বা কে জানে!

বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বনহুর মনিরাকে—মনিরা লক্ষ্মীটি হাসি মুখে আমাকে বিদায় দাও? হাসো—হাসো মনিরা?

আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

পাগলী মেয়ে তা কি হয়—সে যে অনেক দূরের পথ।

না না, তা হবে না, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না। তাহলে আমাকে তুমি কান্দাই রেখে এসো।

আচ্ছা তাই হবে, ফিরে এসে তোমায় কান্দাই নিয়ে যাবো। এবার আমাকে যেতে দাও।

অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললো মনিরা—কবে ফিরে আসবে আমাকে কথা দিয়ে যাও তবে!

বনহুর মনিরার চোখের পানি হাত দিয়ে মুছে বললো—সঠিক বলে যাওয়া সম্ভব নয় মনিরা। তবে শীঘ্রই ফিরে আসবো বলে আশা করি।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মনিরা বিদায় সম্ভাষণ জানালো তার স্বামীকে।

খুশি হলো বনহুর। স্ত্রীর ললাটে একটা চুম্বনরেখা এঁকে দিয়ে বললো— চলো মনিরা, এবার তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

চলো।

মনিরাকে শিবাজী-বেশি বনহুর যখন বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো তখন রাত গভীর হয়ে এসেছে।

বনহুর শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলো। তারপর গাড়ী নিয়ে হাজির হলো সাপুড়ে আস্তানায়।

সাপুড়ে সর্দার তার দলবল নিয়ে তৈরী হয়ে নিয়েছে। এমনকি নূরীও যাবে তাদের সঙ্গে। শুধু রংলালকে নেবে না সাপুড়ে সর্দার। বনহুরও সাপুড়েদের দলে সাপুড়ে সেজে নিলো।

মাথায় পাগড়ী কানে বালা, হাতে বালা গায়ে ছোট্ট ধরনের ফতুয়া পায়ে নাগড়া। হঠাৎ করে কেউ দেখলে তাকে সাপুড়ে যুবক ছাড়া কিছুই বলবে না।

এ ড্রেসে অদ্ভুত সুন্দর মানিয়েছে বনহুরকে।

সাপুড়ে সর্দার দলবল নিয়ে রওয়ানা হলো কাহাতুর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে।

তিরিশ বছর পূর্বে এই পথে একদিন রওয়ানা দিয়েছিলো সাপুড়ে সর্দার। সেদিন তার সঙ্গে ছিলো একমাত্র পিতা মতিলাল। আজ মতিলাল নেই— আজ দলের সর্দার হীরালাল।

গভীর রাতে ওরা রওনা দিলো।

হীরালাল, বনহুর কেশব আর সাপুড়ে পল্লীর কেউ জানলো না এরা কোথায় গেছে।

দিল্লী নগরী পিছনে পড়ে রইলো, এগিয়ে চলেছে সাপুড়ে দল।

নূরীর আনন্দ আর ধরে না, বিশেষ করে তার আনন্দের কারণ— সঙ্গে আছে বনহুর স্বয়ং। বনহুরের পাশে পাশে চঞ্চল যুবতী নূরী নৃত্যের ভঙ্গীমায় এগিয়ে চলেছে।

কতদিন পর আবার সে পাশে পেয়েছে তার চিরসাথী বনহুরকে। দু'চোখে তার আনন্দের দ্যুতি উছলে পড়ছে। ধমনীতে তার প্রবাহিত হচ্ছে উষ্ণ রক্ত। পায়ের নুপুরে রুমঝুম্ শব্দ হচ্ছে।

❑

রাত ভোর হয়ে এলো।

তখন তারা দিল্লী নগরী ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে।

সর্দার হীরালাল পিঠের বোঝা নামিয়ে রাখলো একটা পাথর খন্ডে বললো —এখানে আমরা আরাম করিবো বাবুজী।

বনহুর আর কেশবও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বললো বনহুর—বেশ তাই হোক।

কেশব হেসে বললো—ফুল বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছে।

নূরী রাগতঃ কণ্ঠে বললো—হাঁপিয়ে পড়ার মেয়ে নূরী নয়।

সর্দার নূরীর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো—সাবাস বেটি।

বনহুর আর নূরীর দৃষ্টি বিনিময় হলো।

হাসলো বনহুর।

ওরা যখন বিশ্রাম করছে তখন একটা ছোরা হঠাৎ এসে গেঁথে গেলো সর্দারের পায়ের কাছে।

চমকে উঠলো সবাই।

বনহুর ছোরাখানা টেনে তুলে নিলো হাতে।

সর্দার বললো—ও ছোরা রংলালের আছে। শয়তান হামার পিছু নিয়াছে বাবুজী।

নূরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো মুহূর্তের জন্য ভয়ার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—রংলাল।

বললো সাপুড়ে সর্দার—বাবুজী, ঐ বদমাইস বড় সাংঘাতিক মানুষ আছে। হামাদেরও বিপদে ফেলতে পারে বাবুজী।

বনহুর ছোরাখানা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—সর্দার কোনো ভয় তুমি করো না। রংলাল কেন, অমন সাতজন রংলালকে আমি দেখে নেবো।

বাবুজী তোমার কথা যেন ঠিক হয় বাবুজী।

সঙ্গে শুকনো রুটী আর কিছু রান্না করা মাংস নিয়েছিলো তাই পেট পুরে খেলো ওরা। তারপর আবার রওয়ানা দিলো সম্মুখের দিকে।

গহন জঙ্গল অতিক্রম করে এগিয়ে এলো সাপুড়ে সর্দারের দল।

আরও একটি দল সাপুড়ে সর্দারের দলের অগোচরে তাদের অনুসরণ করে চলেছে। সে হলো রংলালের দল। তাদের সঙ্গে আছে কয়েকজন লোক। সব গুন্ডা এবং শয়তান লোক। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা চলেছে।

রংলাল জানতো, তার কাকা কোনো গুপ্ত গুহার সন্ধান জানে এবং সে গুহায় যে প্রচুর ধনরত্ন সঞ্চিত রয়েছে তাও সে জানতো। হীরালাল কোনোদিন তাকে না বললেও সে এ সংবাদ গোপনে সংগ্রহ করে নিয়েছিলো।

রংলালের দলে ছিলো একজন শিক্ষিত লোক। যে লোকটি সেদিন নূরীকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হতে চেয়েছিলো। লোকটা দিল্লীর একজন

অধিবাসী। কুকর্মই তার পেশা ও নেশা। রংলালকে বশীভূত করে সে চেয়েছিলো নূরীকে হস্তগত করতে। এজন্য ওকে সে প্রচুর অর্থও দিয়েছিলো। কিন্তু বনহুরের জন্য কার্যসিদ্ধ হয়নি।

সেদিন নূরীকে নিয়ে পালাচ্ছিলো লোকটা। হঠাৎ বনহুর এসে পড়ায় তার সমস্ত আশা পন্ড হয়ে গিয়েছিলো। দূর থেকে রংলাল লক্ষ্য করেছিলো, ভেবেছিলো ওকে ধরতে আর পারবে না। তারপর যখন বনহুর নূরীসহ ফিরে এলো তখন তার মুখ চুন হয়ে গিয়েছিলো। এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেছিলো বনহুরের মুখের উপর।

বনহুর পাল্টা জবাব দিয়েছিলো মুষ্ঠিঘাতে।

বনহুরের ঘুষি খেয়ে রংলালের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিলো, কোনো রকম টুশব্দ করতে সাহসী হয়নি সেদিন রংলাল।

কিন্তু তার মনে যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো সে অতি ভয়ঙ্কর। কৌশলে সে এর প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। পুনরায় যোগ দিলো সেই দুষ্ট লোক হরনাথের সঙ্গে যে নূরীকে হস্তগত করতে নিয়েও পারেনি।

রংলালের দলে ছিলো সাত জন আর বনহুরের দলে ছিলো তারা মাত্র চার জন। সাপুড়ে সর্দার কেশব, বনহুর আর নূরী। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে বনহুরের নিকটে ছিলো তার রিভলভার ও একটি ছোরা। সাপুড়ে সর্দারের কাছে এবং কেশবের কাছে ছোরা আর বল্লম ছিলো।

সাপ ধরার জন্য কয়েকটা ঝাকা আর বাঁশী ছিলো তাদের সঙ্গে আর ছিলো কয়েকটা বড় বড় ত্রিপলের থলে।

সাপুড়ে সর্দার যখন জানতে পারলো রংলাল তাদের অনুসরণ করছে তখন সে অত্যন্ত চিন্তিত হলো। কিন্তু মুখোভাবে সে কিছু প্রকাশ করলো না।

❑

দুই দিন কেটে গেলো।

এখন তারা এমন এক জায়গায় এসে হাজির হলো যেখানে শুধু বন আর বন।

এ দু'ই দিনের মধ্যে রংলালের বা তার দলের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কতকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সাপুড়ে সর্দার। ভেবেছে সে রংলাল হয়তো তাদের খোঁজ না পেয়ে ফিরে গেছে।

গহন বনের মধ্যে নেমে এলো রাতের অন্ধকার।

বিশেষ করে নূরীর দেহ অবসন্ন হয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ একরাত আর দু'দিন তারা অবিরাম চলে বহুদূরে এসে পৌঁছে গেছে। ভীষণ বন— কাজেই রাতের বেলা অগ্রসর হওয়া আর মোটেই সম্ভব নয়।

একটা ফাঁকা জায়গা দেখে তারা বিশ্রামের আয়োজন করলো।

কেশব আর সাপুড়ে সর্দার বন থেকে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালালো।

আগুন দেখলে কোনো হিংস্র জীবজন্তুর আগমন হয় না জানে তারা, তাই বিরাট অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন করলো।

সঙ্গের খাবার পেট পুরে খেলো ওরা।

তারপর পালা করে ঘুমানো ঠিক হলো। প্রথম রাত জাগবে সর্দার স্বয়ং মধ্যরাত বনহুর, ভোর রাত কেশব।

হেসে বললো নূরী—আমি কিন্তু গোটারাত জাগবো তোমাদের সঙ্গে।

কেশব আর বনহুর হেসে উঠলো তার কথায়।

সর্দার বললো—তোমাকে আর জাগতি হবি না মা। তুমহি ঘুমাইতে পারো।

সবাই ঘুমাবার জন্য শয়ন করলো, শুধু জেগে রইলো সর্দার।

সম্মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

বল্লম হস্তে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে সাপুড়ে সর্দার। মাঝে মাঝে অগ্নিকুণ্ডে কাঠ নিক্ষেপ করছিলো সে।

রাত বেড়ে আসছে।

দূর থেকে ভেসে আসছে নানারকম জীবজন্তুর গর্জন। গাছের ঝোঁপের আড়ালে হুতুম পাখী পাখা ঝাপটা দিয়ে উঠছে। কেমন একটা অশুভ ভয়ঙ্কর ভাব বিরাজ করছে সমস্ত জায়গাটা জুড়ে।

হঠাৎ একটা আর্তচীৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। ঘুম ভেংগে গেলো বনহুর, কেশব আর নূরীর। আচমকা উঠে বসলো ওরা। বনহুর একেবারে সাপুড়ে সর্দারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

সাপুড়ে সর্দার আর্তচীৎকার শুনে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো; বনহুর বললো—সর্দার মানুষের চীৎকার বলে মনে হলো।

হাঁ বাবুজী, এ আওয়াজ মানুষের গলার হামি ঠিক ধরিয়াছি।

গহন বনে মানুষ এলো কোথায় হতে তবে কি কোনো পথিক বিপদে পড়েছে। বনহুর কথা কয়টি ব্যস্তভাবে বলে দ্রুত চলে যাচ্ছিলো।

নূরী ওর জামার আস্তিন চেপে ধরে—না না যেও না যেও না হুর, কোনো অমঙ্গল ঘটতে পারে।

সাপুড়ে সর্দার বলে উঠলো—এই গহন জঙ্গলে কে কি হলো দেখার জন্য উতালা হচ্ছো কেন। তুমি যেও না বাবুজী।

তা হয় না সর্দার, তোমরা নূরীর কাছে থাকো, আমি দেখে এক্ষুণি ফিরে আসছি।

আমি তোমাকে যেতে দেবো না হুর। নূরী এঁটে ধরলো বনহুরকে।

বনহুর নূরীর হাত ছাড়িয়ে মশালটা তুলে নিলো বাম হস্তে। আর দক্ষিণ হস্তে নিলো রিভলবার দ্রুত চলে গেলো যেদিক থেকে আর্তচীৎকার ভেসে এসেছিলো সেইদিকে।

নূরী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

সাপুড়ে সর্দার কেশবও হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে যেদিকে চলে গেলো বনহুর।

বাম হস্তে মশাল দক্ষিণ হস্তে গুলীভরা রিভলবার নিয়ে বনহুর সম্মুখে অগ্রসর হলো। ভয়ঙ্কর জঙ্গলে তীব্র আর্তচীৎকার শুনে যে লোক দ্রুত ছুটে যেতে পারে সে কত বড় সাহসী ভাবলো সর্দার; তার দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়ছে যেন।

সাপুড়ে সর্দার নিজেও কম সাহসী নয়, তবু বনহুরের দুঃসাহসে সে অবাক না হয়ে পারলো না। মনে মনে ওকে অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানালো।

বনহুর কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একটা যন্ত্রণাদায়ক গোঙ্গানীর শব্দ শুনতে পেলো।

এবার বনহুর সেই দিকে দ্রুত ছুটতে লাগলো। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর না হতেই তার হস্তস্থিত মশালের আলোতে দেখলো অনতিদূরে একটা ঝোপের পাশে পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত দেহ। পরক্ষণেই নজর পড়লো —মনুষ্য দেহটার বুকে দু'খানা থাবা তুলে দিয়ে বসে আছে একটি ব্যাঘ্ররাজ।

মশালের আলোতে ব্যাঘ্ররাজের চোখ দুটো আগুনের গোলার মত জ্বলে উঠলো।

থমকে দাঁড়ালো বনহুর।

ব্যাঘ্র মহারাজ প্রথম হকচকিয়ে গিয়েছিলো হঠাৎ মশালের আলো দেখে। এবার গর্জন করে উঠলো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।

বনহুরও এ দৃশ্য দেখে একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো কিন্তু পরমুহূর্তে সামলে গিয়ে পর পর দুটো গুলী ছুঁড়লো ব্যাঘ্রটাকে লক্ষ্য করে।

মুখের আহার ত্যাগ করে ব্যাঘ্ররাজ ভীষণ এক গর্জন করে লাফ দিলো সম্মুখে কিন্তু অগ্রসর হতে পারলো না, মুখথুবড়ে পড়ে গেলো মৃতদেহটার পাশে।

বনহুর পুনরায় একটা গুলী নিক্ষেপ করলো তারপর মশাল হস্তে মৃতদেহটার পাশে এসে দাঁড়ালো। মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখলো— একটা বলিষ্ঠদেহী লোক পড়ে আছে ভূতলে! গলা এবং বুকের খানিকটা অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। ঘাড়টা সম্পূর্ণ মুচড়ে ফেলছে। রক্তের চাপ জমাট বেঁধে ওঠেনি এখনও তবু সমস্ত জামাটা লালে লাল হয়ে গেছে। সেকি বীভৎস দৃশ্য!

লোকটার এইমাত্র মৃত্যু ঘটেছে বলেই মনে হলো। কারণ একটু পূর্বেও সে গোঙ্গানীর শব্দ শুনতে পেয়েছিলো।

বনহুর আর বিলম্ব না করে ফিরে এলো সর্দার, কেশব আর নূরীর পাশে। নূরী তো ছুটে গিয়ে বনহুরের বুকে মাথা রেখে ব্যাকুল কণ্ঠে বললো— ইস ফিরে এসেছো! আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

সর্দার আর কেশব এগিয়ে এলো।

বললো সর্দার—কিসের আওয়াজ বাবুজী?

বনহুর বললো—একটা লোককে বাঘে খেয়েছে।

অবাক কণ্ঠে বললো সর্দার—লোক?

হাঁ সর্দার একটা লোককে নৃশংসভাবে বাঘে হত্যা করেছে।

সে রাত আর কেউ ঘুমাতে পারলো না।

তবু বনহুর নিজে রিভলভার হস্তে জেগে রইলো পাহারায়। সর্দার কেশব আর নূরী মিলে অর্দ্ধনিদ্রাভাবে কাটিয়ে দিলো রাতটা।

❑

পরদিন যখন সাপুড়ে সর্দার দলবল নিয়ে ঝোপের পাশে মৃত দেহটার নিকটে এসে হাজির হলো তখন সেখানে কিছু ছেঁড়া রক্ত মাখা জামা কাপড় ও কয়েকখানা হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়লো না।

পাশেই একটু দূরে পড়ে আছে ব্যাঘ্র মহারাজের মৃতদেহ। কতকগুলো ক্ষুদ্রকায় কীট বাঘটার চোখমুখ ছিদ্র করে মাংস বের করে ফেলেছে।

এখানে বিলম্ব করা উচিৎ নয় আর তাই সাপুড়ে সর্দার ওদের নিয়ে রওয়ানা দিলো।

ওদিকে রংলাল তাদের দলবল নিয়ে অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ গতরাতে তারা যখন গহন বনে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখে নিয়ে বিশ্রামের আয়োজন করছিলো ঠিক তখন তাদের দলের উপর আক্রমণ চালায় একটি ব্যাঘ্র এবং সে নিয়ে যায় একজনকে।

গতরাতে বনহুর যে মৃতদেহটাকে ব্যাঘ্র কবল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলো সেই মৃতদেহটাই হলো ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির যে রংলালের দলে যোগ দিয়ে চলেছিলো রত্ন ভান্ডারের সন্ধানে।

রংলালের জনসংখ্যায় একজন কমে গেলেও তারা দমেনি এতোটুকু। মৃত্যুর ভয় তারা পরিহার করেছে রত্নের লালসায়। হরনাথের তো রত্নের চেয়ে বেশি লোভ নূরীর প্রতি। নূরীকে নিজের করে পাওয়ার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে।

সাপুড়ে সর্দারের মনে অফুরন্ত আশা—জঙ্গলে দুটো দিন ভালয় ভালয় কেটে গেলো, এবার তাদের সম্মুখে একটি বড় নদী পড়বে।

ইতিমধ্যে তারা বেশ কয়েকটা নদী পারাপার হয়েছে। এগুলো পার হতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি। নৌকা ছিলো, তাতে করেই পার হয়েছিলো ওরা।

এবার যে নদীর সম্মুখে এসে তারা পৌঁছলো সে নদী পারাপার হবার কোনো নৌকা বা ঐ ধরনের কিছু নেই। কাজেই অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হলো তারা।

নদীতীরেই বন।

সর্দার বললো—এখানে হামাদের অপেক্ষা করতে হবে। কারণ হামাদের একটা ভেলা তৈরী করে নিতে হবে।

সঙ্গে কুঠার এবং দা ছিলো, বনহুর কেশব আর সর্দার মিলে শুরু করলো ভেলা তৈরীর কাজ।

নানারকম গাছ আর লতা দিয়ে কৌশলে তারা একটি ভেলা তৈরী করে ফেললো।

এবার সবাই মিলে ভেলাটা নদীতে টেনে নামিয়ে ফেললো। নূরীর আনন্দ আর ধরে না।

ভেলায় উঠে বসলো সর্দার কেশব আর নূরী।

বনহুর মাঝির কাজ করতে লাগলো। সে একটা লম্বা ডাল নিয়ে পানি টানতে লাগলো।

নূরী হাত দিয়ে পানি নাড়ছে।

সর্দার আর কেশব এরাও এক একটা কাঠের টুকরা হাতে নিয়ে বৈঠার মত পানি টানতে লাগলো।

কখন যে নূরী পা দু'খানা জলস্রোতে নামিয়ে দিয়েছিলো কেউ লক্ষ্য করেনি,হঠাৎ একটা কুমীর লেজের আঘাতে নূরীকে টেনে নেয়।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে পড়ে যায় নূরী।

সর্দার আর কেশব চীৎকার করে উঠে—সর্বনাশ হয়েছে বাবুজী---সর্বনাশ হয়েছে---

বনহুর মুহূর্তে বিলম্ব না করে রিভলভারখানা সর্দারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছোরাখানা মুক্ত করে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো নদীবক্ষে।

নূরীকে তখনও কুমীর আক্রমণ করেনি।

বনহুর নূরীকে বাম হস্তে ধরে ফেললো তারপর তীক্ষ্ণধার ছোরা খানা বাগিয়ে ধরলো উদ্যত করে।

কিন্তু বেশিক্ষণ নূরীকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না। কুমীরটা সোজা এবার বনহুরকে আক্রমণ করে বসলো। নূরীকে ছেড়ে দিয়ে এবার বনহুর কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।

সর্দার আর কেশব সব দেখেছিলো, এবার তারা নূরীকে তাদের ভেলায় উঠিয়ে নিলো।

তখন কুমীর আর বনহুর চলেছে লড়াই।

বনহুর সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা দিয়ে কুমীরের চোখে আঘাতের পর আঘাত করে চললো। কয়েকবার আঘাত করলো খোতনায়। রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো নদীর পানি।

কুমীরকেও পরাজয় বরণ করতে হলো বনহুরের কাছে। চোখে এবং মুখে ভীষণ আঘাত পেয়ে কুমীরটা বনহুরকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালালো।

এবার সর্দার আর কেশব বনহুরকে তুলে নিতে সক্ষম হলো।

বনহুরের দেহের কতক জায়গা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। নূরী তাড়াতাড়ি ওড়না ছিঁড়ে বনহুরের ক্ষত স্থানগুলো বেঁধে দিলো। খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া করলো নূরী। তার নিজের চেয়েও বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলো নূরী বনহুরের জন্য।

বনহুরের বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় নূরী।

সর্দার ক্ষতে ঔষধ লাগিয়ে দেয়।

সাপুড়ে সর্দার তার থলের মধ্যে কিছু কিছু ঔষধও নিয়েছিলো বিপদ-আপদের জন্য। এক্ষণে তা কাজে লাগলো।

বনহুরের ক্ষতগুলো তেমন বেশি সাংঘাতিক বা মারাত্মক হয়নি। অল্পক্ষণেই বনহুর সুস্থ হয়ে উঠলো।

নদীটি অত্যন্ত প্রশস্ত হওয়ায় বেশ সময় লাগলো ওপারে পৌঁছতে।

ওপারে যখন তারা পৌঁছল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে। তীরে পৌঁছতেই তারা একটা গুড়ুম গুড়ুম ঢাকের আওয়াজ শুনতে পেলো।

সাপুড়ে সর্দারের মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। সে ভীত কণ্ঠে বললো—বাবুজী, জংলী রাজা এদিকে আসিতেছে। এখন উপায় কি হইবে!

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর—জংলী রাজা—সে কি রকম সর্দার।

বাবুজী ও মানুষ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর লোক আছে। ওরা মানুষ ভি খায়। কাঁচা মাংস ওরা খুব ভালবাসে।

কান পেতে শুনলো ওরা—গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজটা ক্রমান্বয়ে আরও এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এক সঙ্গে অনেকগুলো ঢাক ওয়ালা নদীর দিকেই এগুচ্ছে।

বনহুর বললো—সর্দার যেমন করে হোক ওদের দৃষ্টি থেকে নিজেদের গোপন রাখতে হবে,নাহলে বিপদ হবে।

হাঁ বাবুজী শুধু বিপদ না হবে, জান বাঁচাতে পারবো না হামরা লোক। কিন্তু কি করা যায়?

কেশব আর নূরীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

কেশব বললো—বাবু, ঐ দেখেন কত মশাল জ্বলে উঠলো।

ওরা সবাই তাকালো সম্মুখে দেখতে পেলো অসংখ্য মশাল এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো পট পট করে। ঢাকের শব্দ আরও তীব্র এবং স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

মশালের আলোগুলো এগিয়ে আসছে দ্রুত নদী তীরের দিকে।

ভেলা ছেড়ে সর্দার কেশব বনহুর আর নূরী নেমে পড়লো তীরে। নদীর ওপার যেমন গহন বনে ঢাকা, এপারে তা নয় উঁচুনীচু কতকগুলো টিলা আর শুধু প্রান্তর। নদীতীর থেকে বহুদূরে নজর যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এলো।

আকাশে জ্বলে উঠলো অসংখ্য তারকারাজি। যদিও এটা শীতকাল নয় তবু নদীতীরে ঠান্ডা হাওয়ায় হাড়ে কাঁপন লাগে।

নূরী তো কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে।

সর্দার ভীতকণ্ঠে বললো—আর দেরী করা যায় না বাবুজী, উহারা আইসে পড়িলো বলো।

বনহুর বললো—সর্দার তুমি ঐ উঁচু টিলাটার ওপাশে যাও আর কেশব তুমি ঐ ওদিকের ঝোপটার আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। মোটেই বিলম্ব করো না, ওরা এসে পড়লো বলে। আর আমরা দু'জনা এই টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়বো।

সর্দার বললো—বাঁচিবার যখন কোনো উপায় নেই বাবুজী তখন তাই করিবো। চলো কেশব হামরা উধারে যাই। বাবুজী আপনি মাই ফুলরে নিয়া শীগ্গির লুকাইয়া পড়েন।

এসো নূরী। বনহুর নূরীর হাত চেপে ধরলো।

একি তুমি কাঁপছো নূরী? তুমি না দস্যু দুহিতা?

হুর, আমার জন্য ভয় আমি করি না। তোমার জন্য আমার চিন্তা এইতো কুমীরটার পাল্লায় পড়ে কতকষ্ট পেলে! কত রক্তপাত হয়েছে তোমার একটু পূর্বে। আবার যদি---

এতো বিপদেও বনহুর হাসলো—সাধে বলে নারী প্রাণ। মরতে হয় এক সঙ্গে মরবো তাতে দুঃখ কি বলো?

হুর, ঐ দেখ কি ভয়ঙ্কর জংলী দল এগিয়ে আসছে।

সম্মুখে দৃষ্টি ফেলতেই দেখলো অসংখ্য জংলী এগিয়ে আসছে। সমস্ত দেহ উলঙ্গ সামান্য একখন্ড চামড়া দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। প্রত্যেকের হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল আর দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ—ধার বল্লম।

এক একটা জংলীর চেহারা জমকালো। বলিষ্ঠ দেহ, যেন পোড়া লোহার তৈরী। মাথায় পাখীর পালকের টুপি। কানে লোহার বালা, হাতেও বালা আছে অনেকের।

সবাই আনন্দধ্বনি করছিলো আর একটা অদ্ভুত শব্দ করেছিলো।

সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে একদল জংলী গলায় ঢাক বেঁধে এগুচ্ছে তারাই বাজাচ্ছিলো ঢাকগুলো। সেকি গুরুগম্ভীর গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ।

জংলীদের চেহারা দেখে শিউরে উঠলো নূরী। বনহুরের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললো—ওরা যদি আমাদের দেখে ফেলে তাহলে কি উপায় হবে?

কি আর হবে—আত্মাহুতি দিতে হবে।

আমার ভয় করছে হুর।

বনহুর নূরীকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিলো, ফিস ফিস করে বললো—চুপ করে থাকো নূরী। ওরা ওদিকেই চলে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ একটা আর্তচীৎকারে চমকে উঠলো বনহুর, বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে দেখলো কয়েকজন জংলী কেশবকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। নূরী এ দৃশ্য লক্ষ্য করা মাত্র চীৎকার করতে যাচ্ছিলো—বনহুর হাতচাপা দিলো ওর মুখে। তারপর চাপা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—চুপ, ওরা শব্দ পেলেই এদিকে ছুটে আসবে।

নূরী ভীত করুণ স্বরে বললো —কেশবের এখন কি হবে হুর?

প্রায় একশতের বেশি হবে জংলী কেশবকে ঘিরে ধরে অদ্ভুত শব্দ করছে আর ধেই ধেই করে নাচছে। জংলীদের চীৎকারের সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে। মশালের আলোতে দেখলো ওরা—কেশবের মুখ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

বনহুর রিভলভার উদ্যত করে ধরলো, বললো সে—কেশবকে বাঁচাতেই হবে।

নূরী বনহুরের হাত চেপে ধরলো, কম্পিত কণ্ঠে বললো— সর্বনাশ হবে হুর তোমার রিভলভার কজনাকে কমাতে পারবে বরং ওরা আমাদের সন্ধান পেয়ে এদিকে ছুটে আসবে!

তা হয় না, কেশবকে এভাবে মরতে দেব না নূরী।

কিন্তু আমরা সবাই যে মরবো তাহলে?

কি করা যাবে বলো, মরতে হয় সবাই এক সঙ্গে মরবো।

না না, তা হয় না হুর, আমি সব সহ্য করতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তোমাকে হারাতে পারবো না।

নূরী!

হুর, তুমি গুলী করো না শব্দ হলেই ওরা তীরবেগে আমাদের আক্রমণ করবে।

নূরী, দেখছো না কেশবের কি অবস্থা? বেচারাকে এক্ষুণি ওরা হত্যা করে খেয়ে ফেলবে।

বনহুরের কথা মিথ্যা নয়—কতগুলো জংলী কেশবকে নিয়ে ধেই ধেই করে নাচছে। যেমন খেলোয়াড়দের হস্তে ফুটবলের অবস্থা হয়। এ ওর হাতের উপর ছুঁড়ে দিচ্ছে যেন একখন্ড পাউরুটি।

বনহুরের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো,—তার হস্তের রিভলভার গর্জে উঠলো, রাত্রির জমাট অন্ধকার ভেদ করে ছুটে এলো একটা গুলী।

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো একটি জংলী।

মুহূর্তে ঢাকের আওয়াজ গেলো থেমে।

বনহুরের রিভলভার পুনঃ পুনঃ গর্জে উঠতে লাগলো এবং পর পর তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ছে এক একটি জংলী।

অল্পক্ষণের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো জংলী দল। সবাই অদ্ভুত শব্দ করতে লাগলো। বিপদসূচক শব্দ এটা।

কতকগুলো জংলী বনহুর আর নূরী যে টিলাটার ওদিকে লুকিয়েছিলো সেইদিকে ছুটে আসতে লাগলো।

বনহুর পর-পর তাদের এক একজনকে ধরাশায়ী করে চললো। তার জামার পকেটেই ছিলো রিভলবারের গুলী, দ্রুতহস্তে রিভল ভারে গুলী ভরে নিচ্ছিলো সে।

কিন্তু বনহুর বেশীক্ষণ ওদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠলো না। পিছন দিক থেকে কতগুলো জংলী বল্লম হাতে ঘিরে ধরলো। ওদিকে সাপুড়ে সর্দারকেও কয়েজন জংলী হিড়হিড় করে টেনে এনেছে। বনহুর আর নূরীর চারপাশে অসংখ্য জংলী বল্লাম উঁচু করে দাঁড়ালো।

বনহুর জংলীদের অলক্ষ্যে রিভলভারটা পকেটে গোপন করে রাখলো।

জংলীদল এবার বনহুর কেশব, সাপুড়ে সর্দার আর নূরীকে মাঝখানে রেখে ধেই ধেই করে নাচা শুরু করলো।

জংলীদের যে কয়েকজনকে বনহুর গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছিলো, তাদের লাশগুলো জংলীরা নদীর পানিতে নিক্ষেপ করলো।

হাউ মাউ করে কয়েকজন কাঁদলো। কি যেন সব বিলাপ করলো মাথায় আঘাত করে!

এবার জংলী দল বনহুরের দলকে ঘেরাও করে নিয়ে ঢাক বাজিয়ে ফিরে চললো।

কেশব তো বনহুর আর নূরীকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সর্দারের মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

নূরীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। বার বার সে করুণ চোখে তাকাচ্ছে সর্দার আর বনহুরের দিকে।

জংলীর দল তাদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সম্মুখে একজন জংলী ঢাক বাজিয়ে এগুচ্ছে।

মাঝে মাঝে সবাই একরকম অদ্ভুত শব্দ করছিলো। সেকি ভয়ঙ্কর তীব্র শব্দ! সাধারণ মানুষের কানে এ শব্দ তালা লাগিয়ে দেয়। বনহুরের সাহসী প্রাণেও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে— এবার হয়তো তাদের আর রক্ষা নেই। জংলীদের হস্তে মৃত্যু অনিবার্য।

সাপুড়ে সর্দার জংলীদের ভাষা কিছু জানতো —সে ঐ ভাষায় অনুনয় বিনয় শুরু করলো, করজোড়ে প্রার্থনা করতে লাগলো কিন্তু কেউ তার কথা শুনলো না।

বনহুর নূরী আর কেশবকে লক্ষ্য করে বললো—অহেতুক রোদন বাতুলতা মাত্র। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

বেশ কিছুদূর অতিক্রম করার পর শুরু হলো আবার জঙ্গল— সেই ভয়ঙ্কর গহন বন। মশালের আলোতে জংলীরা পথ দেখে অগ্রসর হচ্ছিলো।

যদিও জংলী দল হই-হুল্লোড় করে এগুচ্ছিলো কিন্তু তাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিলো সাপুড়ে সর্দার বনহুর কেশব আর নূরীর উপর — এক মুহুর্তের জন্যও তারা বল্লম নীচু করেনি। কয়েকজন সুতীক্ষ্ণ বল্লম উদ্যত করে ধরে পথ চলছিলো।

প্রায় ঘন্টা দুই অবিরাম চলার পর জঙ্গলের মধ্যে একটা বেদী বা মন্ত্রের মত উঁচু জায়গায় এসে থামলো জংলীর দল।

বনহুর লক্ষ্য করলো, উঁচু জায়গাটা মাটি বা পাথর নয়। কিছু সংখ্যক বড় বড় কাঁটা দিয়ে তৈরী একটা মঞ্চ বনের মাঝখানে উঁচু হয়ে রয়েছে।

এবার জংলী দল বন্দীদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঢাক বাজাতে শুরু করলো।

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের উপরে কয়েকজন মশালধারী জংলী উঠে গিয়ে দাঁড়ালো। সমস্ত বনভূমি মশালের আলোতে আলোময় হয়ে উঠলো।

হঠাৎ ঢাকের আওয়াজ থেমে গেলো।

বনহুরের দল তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হলো। দেখলো— বেদী বা ঐ মঞ্চটার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে এক নারীমূর্তি। সমস্ত দেহ তার উলঙ্গ শুধু মাথায় একটা হরিণের চামড়া জড়ানো চুলগুলো মাথার উপরে উঁচু করে বাঁধা। গলায়, হাতে বাজুতে কতকগুলো পাথরের টুকরো মালার মত করে গাঁথা রয়েছে। এসব পাথরের টুকরো থেকে একরকম আলোকরশ্মি ঠিকরে বেরুচ্ছিলো। কোনোটা লাল, কোনোটা নীল আবার কোনোটা থেকে ফিকে সবুজ আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো।

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও বনহুরের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। নারীমূর্তিকে দেখে নয় তার দেহসজ্জিত পাথরখন্ডগুলোর উপর নজর পড়তেই সে বুঝতে পেরেছিলো—ওগুলো মূল্যবান পাথর।

নারীমূর্তি মঞ্চের উপরে এসে দাঁড়ালো।

তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলো বন্দীদের দিকে তাকিয়ে।

সাপুড়ে সর্দার করজোড়ে প্রণাম জানাতে লাগলো।

কেশব আর নূরী আকুলভাবে রোদন করে চলেছে।

বনহুর স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালো নারীমূর্তির দিকে। বনহুরের চোখেও যেন আগুন ঝরে পড়ছে। বনহুর দেখলো নারীমূর্তির দুটি চোখ এবার তার উপর এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। জংলী হলেও যুবতীকে সুন্দরী বলা চলে। কালো নিটোল দেহ, টানাটানা দু'টি ভ্রূ যেন দুটো বাঁকা তারবারি। চোখ দুটো যেন কাঁচের টুকরো। মশালের আলোতে চোখ দুটো যেন সাপের চোখের মত মনে হলো।

নারীমূর্তি বনহুরের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ নজরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর হাতের ইংগিতে বনহুরকে দেখিয়ে কি যেন বললো।

নারীমূর্তির শ্যেন দৃষ্টি যে বনহুরের উপর এসে স্থির হয়েছে— এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য না করলেও নূরীর দৃষ্টি এড়ালো না। সে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

নারীমূর্তি এবার মঞ্চ থেকে নেমে অদৃশ্য হলো মঞ্চের নীচে। জংলীরা বন্দী সবাইকে টানতে টানতে নিয়ে চললো। ওদিকে কিছুদূর গিয়েই দেখলো, মস্তবড় একটা খাঁচার মত বন্দীখানা। জংলীরা এবার সাপুড়ে সর্দার কেশব আর নূরীকে ঐ খাঁচায় বন্দী করে ফেললো। বনহুরকে বের করে নিলো ভিতর থেকে। নূরী তো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো —হুর তোমাকে যেতে দেবো না।

কিন্তু জংলীরা শুনলো না নূরীর কোনো বাধা। বনহুরকে নিয়ে চলে গেলো। নূরী কাঠের খাঁচায় মাথা ঠুকে বিলাপ করতে লাগলো।

সাপুড়ে সর্দার বা কেশবের মুখে কোনো কথা নেই। সর্দার ভাবছে তার জন্যই আজ সকলের এ অবস্থা।

কয়েকজন জংলী বনহুরকে সঙ্গে করে নিয়ে চললো। বেশ কিছুটা চলার পর একটা ঝোপঝাড় আর জঙ্গলে ঢাকা সুড়ঙ্গমুখের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। সুড়ঙ্গমুখেই ছিলো দুজন বল্লমধারী জংলী, তাদের হাতে ছিলো চোং ধরনের এক একটা বাঁশী।

জংলিগণ বনহুরকে নিয়ে সুড়ঙ্গমুখে পৌঁছতেই চোংধারী দু'জন জংলী চোঙ্গে মুখ লাগিয়ে বাজাতে লাগলো। ভোঁ ভোঁ শব্দে বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ মুখের কপাট সরে গেলো এক পাশে।

বনহুরকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো এবার দু'জন জংলী। বাকী গুলো সুড়ঙ্গ মুখের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর এবং জংলীদ্বয় সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে চললো।

জংলীদ্বয়ের হস্তে জ্বলন্ত মশাল।

মশালের আলোতে বনহুর সুড়ঙ্গ মধ্যে নজর রেখে এগুতে লাগলো। সুড়ঙ্গ মধ্যে অন্ধকার হলেও বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পাথর দিয়ে মজবুত করে তৈরী পথ। কিন্তু সুড়ঙ্গপথের উচ্চতা খুব বেশি নয় জংলীরা লম্বায় বেঁটে আকার তাই তাদের পথের উচ্চতাও কম। বনহুরকে অবশ্য মাথা নীচু করে চলতে হচ্ছিলো। একটু অসাবধান হলেও মাথা ঠুকে যাবার সম্ভাবনা ছিলো।

কিছুটা পথ অগ্রসর হতেই আর একটা দরজার মুখ পাওয়া গেলো। কাঠের তৈরী দরজার মুখে দু'জন জংলী বল্লম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতেও এক একটা চোং রয়েছে।

বনহুরকে নিয়ে জংলীদ্বয় দরজা মুখে পৌঁছতেই প্রথম সুড়ঙ্গ মুখের জংলীদ্বয়ের মত চোংগে ফুঁ দিলো সঙ্গে সঙ্গে দরজার মুখ খুলে গেলো।

বনহুর আর জংলীদ্বয় প্রবেশ করলো ভিতরে।

আর একটি সুড়ঙ্গমুখ পেরিয়ে তবে বনহুরকে নিয়ে জংলীদ্বয় হাজির হলো একটা গুহার মধ্যে।

গুহাটা খুব বড় এবং পাথর দিয়ে তৈরী।

গুহার চার কোণে চারটা মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছে।

বনহুর তাকালো সম্মুখে, বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখলো—সেই যুবতী নারীমূর্তি একটা আসনে উপবিষ্টা। তার পাশে কয়েজন জংলী বল্লম হস্তে দন্ডায়মান রয়েছে।

বনহুর নারীমূর্তির দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকালো।

মশালের উজ্জ্বল আলোতে তার শরীরের পাথরখন্ডগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। তীব্র আলোকচ্ছটা যেন ঠিকরে বের হচ্ছে ঐ সব রত্নাভরণ থেকে।

নারীমূর্তি বনহুরের দিকে নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো। হাত দিয়ে ইংগিৎ করলো সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে দন্ডায়মান জংলীগুলো গুহা থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। বনহুরের সঙ্গী জংলীদ্বয়ও বেরিয়ে গেলো তাদের সঙ্গে।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

তার দেহে এখনও সাপুড়ে ড্রেস বর্তমান। কানে বালা, হাতে বালা রয়েছে। গায়ের জামাটা অবশ্য কয়েক স্থানে ছিঁড়ে গেছে। কুমীরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে জামাটার এ অবস্থা হয়েছে। হাতে এবং বুকের ক্ষতে এখনও পট্টি বাঁধা রয়েছে যদিও তবু বনহুরকে এ ড্রেসে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো।

দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ পুরুষ বনহুরের সৌন্দর্যে অভিভূতা জংলী রাণী। সভ্য সমাজের মানুষ বুঝি সে কোনোদিন দেখেনি।

আসন ত্যাগ করে জংলী রাণী উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে দেখছে।

জংলী রাণী বনহুরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার দক্ষিণ হাতখানা এগিয়ে দিলো।

বনহুর কিছু বুঝতে না পারলেও সে তার দক্ষিণ হাতখানা জংলী রাণীর দক্ষিণ হাতের উপর রাখলো।

জংলী রাণীর চোখ দুটো যেন মুহূর্তে আনন্দ-উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঠোঁট দুটির ফাঁকে ফুটে উঠলো হাসির রেখা। বনহুরের হাতের উপর মুখ রেখে চুম্বন করলো গভীর আবেগে।

বনহুর বিস্মিত হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

জংলী রাণী এবার বনহুরকে হাত ধরে নিয়ে চললো। বনহুর কোনো আপত্তি না করে অগ্রসর হলো তার সঙ্গে। জংলী রাণী এবার বনহুরকে বসিয়ে দিলো তার নিজের আসনে।

বনহুর বুঝতে পারলো এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা পেলো তার। নিজের দেহের দিকে তাকালো বনহুর—অসংখ্য ধন্যবাদ দিলো সে খোদাতায়ালাকে। ভাগ্যিস কার্পণ্যহীনভাবে তার দেহে তিনি সৌন্দর্যের বিকাশ করেছিলেন তাই মরণ ছোবল থেকে তার প্রাণ রক্ষা পেলো আজ। শুধু আজ নয়, এমনি আরও কতবার সে জীবন রক্ষা পেয়েছে।

জংলী রাণী ওপাশ থেকে একটা ঝুড়ি হাতে তুলে নিয়ে এগিয়ে এলো বনহুরের সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলো।

বনহুর দেখলো ঝুড়িটার মধ্যে অনেকগুলো নাম না-জানা অদ্ভুত ধরনের ফল রয়েছে। বনহুর একটা ফল হাতে তুলে নিলো।

জংলী রাণী খুশি হলো বনহুরের আচরণে।

বনহুর ফলটা ভক্ষণ করতে লাগলো।

অত্যন্ত সুস্বাদু ফল, বনহুর সমস্ত ফলটা খেয়ে ফেললো।

জংলী রাণী এবার বনহুরের সম্মুখে একটা মাটির পাত্র উঁচু করে ধরলো।

চমকে উঠলো বনহুর মাটির পাত্রটা নিয়ে পাশে নামিয়ে রাখলো। দস্যু সে, কিন্তু রক্তপিপাসু নয়। বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবার।

জংলী রানী পুনরায় বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা উঁচু করে ধরলো, তারপর এগিয়ে চললো তাকে নিয়ে।

এবার অন্য একটা পথ ধরে অগ্রসর হলো জংলী রাণী। যাবার সময় একটা মশাল সে হাতে তুলে নিয়েছিলো।

কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখলো বনহুর—সম্মুখে বন্ধ দরজা। রাণীকে দেখেই দরজা মুক্ত করে দিলো দু'জন জংলী। তারপর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

জংলী রাণী বনহুরকে নিয়ে একটা কক্ষমত জায়গায় এসে দাঁড়ালো। তারপর নিজের কণ্ঠ থেকে একটা মালার মত লকেট খুলে পরিয়ে দিলো বনহুরের গলায়।

এবার জংলী রাণী করতালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের সেই মশালধারী জংলী এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

জংলী রাণী ইশারা করলো।

বনহুরকে ওরা নিয়ে যাবার জন্যই এসেছে বুঝতে পেরে বনহুর ওদের সঙ্গে অগ্রসর হবার জন্য পা বাড়ালো।

কিন্তু জংলী রাণী পুনরায় বনহুরের দক্ষিণ হস্ত উঁচু করে হাতের পিঠে চুম্বন করলো।

বনহুর নিজের অজ্ঞাতেই একবার তাকালো জংলী রাণীর মুখের দিকে। দেখলো জংলী রাণীর ঠোঁটের কোণে সেই পূর্বের হাসির আভাষ ফুটে উঠেছে।

জংলীদ্বয় বনহুরকে নিয়ে পরপর কয়েকটা দরজা পেরিয়ে আবার ফিরে আসে সেই বন্দীশালায়।

কাঠের মজবুত দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গেলো বনহুরকে। বনহুরের কণ্ঠে তখনও শোভা পাচ্ছে জংলী রাণীর দেওয়া রত্নাভরণ সেই হারখানা।

বনহুরকে দেখতে পেয়ে নূরী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে—হুর ফিরে এসেছো তুমি? হায়, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে ওরা নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলবে।

বনহুর নূরীর মাথায়-পিঠে হাত বুলিয়ে বললো—হত্যা ওরা আমাকে করবে না বলেই মনে হলো।

একি! তোমার গলায় এ হার এলো কোথা হতে হুর? নূরী বনহুরের গলার হারটা উঁচু করে ধরে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললো।

স্মিত হেসে বললো বনহুর—জংলী রাণীর উপহার।

রুদ্ধ কণ্ঠে বললো নূরী—জংলী রাণী?

হাঁ, যাকে প্রথম আমরা ঐ মঞ্চের উপর দেখেছিলাম।

কি সর্বনাশ! ঐ জংলী রাণী তোমাকে----না না, ওটা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো হুর, ওটা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

নূরী, এটা ফিরিয়ে দিলে হয়তো জীবন দিতে হবে। থাক না ক্ষতি কি? তাছাড়া জানো এটা মূল্যবান হীরক।

চাই না হীরক। এটা দিয়ে তোমাকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে। নূরী বনহুরের বুকে মাথা রেখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো।

বনহুর নূরীর চিবুক ধরে উচু করে বললো—নূরী, আমাদের এতোগুলো জীবনের পরিবর্তে জংলী রাণীর কাছে আত্মসমর্পণ করাই কি উচিৎ নয়?

না, আমি তা চাই না। মৃত্যু আমার কাছে অনেক ভাল তোমাকে হারানোর চেয়ে।

আমি যদি রাণীকে তার উপহার ফিরিয়ে দেই তার পরিণতি কি জানো?

জানি মরতে হবে।

শুধু আমাকে নয়, তোমাকেও ওরা হত্যা করবে আর ঐ ওদের দু'জনাকে। দুটো নিরীহ প্রাণ আমাদের জন্য বিনষ্ট হবে।

নূরী তাকালো—অসহায় করুণ চোখে তাকিয়ে আছে কেশব আর সাপুড়ে সর্দার তাদের দিকে। চোখে মুখে ভীত ভাব। মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

বললো বনহুর—নূরী, জংলীরা কত বড় ভয়ঙ্কর তা আমি একটু পূর্বেই বুঝতে পেরেছি। ওরা আমাকে তাজা রক্ত এনে দিয়েছিলো পান করার জন্য।

নূরী কোনো কথা বললো না নীরবে রোদন করে চললো। পুব আকাশ দৃষ্টিগোচর হলেও বোঝা গেলো রাত ভোর হয়ে আসছে। বন্য মোরগ দলের কণ্ঠ ভেসে আসছে দূর দূরান্ত থেকে। পাখীরা সব বৃক্ষ শাখায় কলরব শুরু করেছে।

বনহুরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী।

সাপুড়ে সর্দার আর কেশব কাঠের খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে নাক ডাকাচ্ছে।
বনহুরের চোখেও নিদ্রা জড়িয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে সেও কাঠের খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে।

❑

মাসুমা, আমার মন বলছে সে কোনো বিপদে পড়েছে। আমি যে বড় অস্থির বোধ করছি ভাই। মনিরা প্রায় কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে কথাটি বললো।
মাসুমা হাসার চেষ্টা করে বললো—ছিঃ অযথা মন খারাপ করা উচিৎ নয়, তাছাড়া তোর স্বামী তো আর ছোট্ট ছেলে নয়। তাঁর চেহারা দেখেই মনে হয় অসীম শক্তিবান তিনি। সত্যি মনিরা তোর স্বামী ভাগ্য বলতে হবে।
কিন্তু ভাগ্য হলে কি হয় বল্ তাকে তো ধরে রাখতে পারলাম না কোনোদিন। ওকে ভালবেসে চিরদিন আমার চোখের পানি শুকালো না মাসুমা। আর যে আমি পারছি না সহ্য করতে।
কি করবি সহ্য না করে কি উপায় আছে! যেমন গেছেন তেমনি আবার হঠাৎ একদিন এসে হাজির হবেন।
আর যদি তার কোনো অমঙ্গল ঘটে থাকে?
ও সব চিন্তা করতে নেই বোন। নিশ্চয়ই তিনি ভাল আছেন। আবার ফিরে আসবেন।
মনিরা মাসুমার সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হতে পারে না। কে যেন তার মনের গহনে ডেকে বলছে—তোমার স্বামীর অমঙ্গল ঘটেছে। তার সম্মুখে ভয়ঙ্কর বিপদ।
মনিরার চোখের অশ্রুতে বসন সিক্ত হয়।
মাসুমা চিন্তিত হলো। ক'দিন সে এমনি সান্ত্বনা বাক্যে ওকে ভুলিয়ে রাখবে!
হাশেম চৌধুরীও ভয়ঙ্কর ভাবনায় পড়লেন। মনিরা সব সময় বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুধু রোদন করছে। নাওয়া-খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিলো সে। এমনি করে ক'দিন বাঁচতে পারে মানুষ।!
বনহুরের জন্য শুধু মনিরাই নয়, নূরীর অবস্থাও তাই হয়েছে। নূরী কাঁদছে বনে জংলীদের বন্দীশালায় বসে; আর মনিরা কাঁদছে দিল্লী নগরীর বুকে। মনিরা স্বামীর বিরহে উন্মাদিনী আর নূরীর প্রিয়কে হারানোর আশঙ্কা।
জংলী রাণীর নজরে পড়েছে বনহুর।

ভোর হতেই ঢাকের আওয়াজে ঘুম ভেংগে গেলো নূরীর। সাপুড়ে সর্দার কেশব আর বনহুরও জেগে উঠেছে । সবাই বিস্ময়ভরা নয়নে দেখলো— বন্দীশালার বাইরে কয়েকজন জংলী বর্শা হস্তে দন্ডায়মান। আর দুইজন প্রবেশ করেছে বন্দী শালার ভিতরে।

অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো বন্দীশালার ভিতরে প্রবেশকারী জংলীদ্বয় ইংগিৎ করলো উঠবার জন্য বনহুরকে।

বনহুর উঠতে যাচ্ছিলো, নূরী বনহুরের হাত চেপে ধরলো। না না, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না— কিন্তু নূরীর কোনো বাধাই শুনলো না জংলীদ্বয়, বনহুরকে টানতে টানতে বের করে নিয়ে চললো।

নূরী আকুলভাবে কেঁদে উঠলো।

সর্দার আর কেশবের চোখও শুষ্ক ছিলো না।

পর-পর আবার কয়েকজন জংলী এসে নূরী, কেশব আর সাপুড়ে সর্দারকেও বেঁধে নিয়ে চললো।

ঢাকের আওয়াজ গুরুগম্ভীরভাবে বেজে চলেছে। তার সঙ্গে শোনা যাচ্ছে জংলীদের অবিশ্রান্ত কলধ্বনি।

নূরী সর্দার এবং কেশব মঞ্চের নিকট পৌঁছলো। ওরা দেখলো—সুউচ্চ কাষ্ঠমঞ্চের উপরে উপবিষ্টা জংলী রাণী, পাশে আজ আর একটি অদ্ভুত জংলী বসে আছে। ঠিক জংলীহস্তীর মত তার চেহারা। জমকালো গায়ের রং মাথায় সজারু কাঁটার মত খাড়া খাড়া চুল। চোখ দুটো দেহের আকারে অনেক ছোট আর লাল। সমস্ত দেহে সাদা রং এর চিত্র আঁকা।

জংলী রাণীর ঠিক দক্ষিণ পাশে বসেছিলো ভীমকায় জংলীটা।

অল্পক্ষণেই বুঝতে পারলো নূরী—জংলী রাণীর পিতা ঐ জংলী। হয়তো জংলী সর্দার হবে। আজ জংলী রাণীর মাথায় পাখীর পালকের মুকুট শোভা পাচ্ছে। মুকুটের মাঝখানে একটা হীরক-খন্ড জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

নূরী, কেশব আর সর্দারকে নিয়ে যেতেই জংলী সর্দার রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত করে তাকালো। তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলো সে।

বনহুরকেও কয়েকজন জংলী ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক জংলীর হস্তে এক একটা সুতীক্ষ্ণ-ধার বর্শা।

বনহুরকে দেখামাত্র নূরী তার দিকে ছুটে যাবার জন্য পা বাড়াতেই জংলীরা তাকে ধরে ফেললো।

সর্দার আর কেশবকেও ধরে রেখেছে কয়েকজন জংলী।

বনহুরের হাত দু'খানা মোটা লতা দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধা রয়েছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর।

সর্দার, কেশব আর নূরীর হাতও বেঁধে এনেছে জংলীরা।
তাদের চারপাশ ঘিরে কতকগুলো জংলী ঢাক বাজিয়ে চলেছে।
হঠাৎ জংলী সর্দার দক্ষিণ হাত উঁচু করে উঠে দাঁড়ালো।
সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেলো।
জংলী দল সমস্ত দেহ নুইয়ে অভিবাদন করলো।
এবার জংলী সর্দার এক রকম অদ্ভুত শব্দ করে উঠলো— হুংহো হুয়াই হু লং লো।
অমনি জংলী দল এক একটা মোটা গাছের গুড়ির সঙ্গে এক এক জনকে বেঁধে ফেললো মজবুত করে।
সারিবদ্ধভাবে কতকগুলো গাছের গুড়ি মাটিতে পোতা রয়েছে।
এক একটা গুড়ির সঙ্গে এক একজনকে পিছমোড়া করে বাঁধলো।
বনহুরকে মাঝের মোটা খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নিলো।
এবার এক মর্মান্তিক দৃশ্য শুরু হলো।
প্রত্যেকটা খুঁটির পাশে চারজন করে জংলী বর্শা উদ্যত করে দাঁড়ালো।
এবার তাদের সম্মুখে একটা অগ্নিকুন্ড জ্বেলে দেওয়া হলো।
দাউ দাউ করে অগ্নিকুন্ডটা জ্বলে উঠলো। গহন জঙ্গলের মধ্যে শুরু হলো এক মহা প্রলয় নৃত্য।
ঢাকের তালে তালে কতকগুলো জংলী নারী-পুরুষ নৃত্য শুরু করলো। যেন হস্তিশাবকগণ দুলে দুলে নৃত্য করছে।
জংলী সর্দার এবার আর একটা শব্দ করলো—হুম্ হুয়াম্ হুই হুই...
অমনি নাচ বন্ধ হলো।
জংলী সর্দার একটা শব্দ করলো—চুংচিও হুম্ হুয়াম্।
তৎক্ষণাৎ কয়েকজন জংলী বর্শা উদ্যত করে দাঁড়ালো।
আর এক মূহূর্ত—এবার নিহত হবে বনহুরের দল।
সেই দন্ডে জংলী রাণী জংলী সর্দারকে লক্ষ্য করে বললো—ভুঁই হু হুম্ নং হুম্......শব্দটা বড় করুণ শোনালো জংলী রাণীর কণ্ঠে। সে আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখালো।
জংলী সর্দার তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বনহুরের দিকে। ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করে উঠলো—নুয়ং হুম্ হুই নো কুম্ কুম্।
জংলী রাণী ভীমকায় জংলী সর্দারের পায়ে উবু হয়ে পা জড়িয়ে ধরলো— ভুঁই হু পিও হুম্ হুম্ নং নো কুম্ ।
পূর্বের ন্যায় গর্জে উঠলো জংলী সর্দার—নো নো কুম্ কুম্ হুই হুম্—
এবার জংলী রাণী মাথার মুকুট খুলে রাখলো জংলী সর্দারের পায়ের কাছে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জংলী হাতের অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখলো।
নত মস্তকে দাঁড়ালো সবাই।
সেকি এক নীরব নিস্তব্ধতা।
মৃত্যু মুহূর্তেও বনহুর, কেশব, সর্দার আর নূরীর চোখে বিস্ময় ঝরে পড়েছে। সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখছে জংলীদের কার্যকলাপ।
এতোক্ষণ তাদের মৃতদেহ কাঠের খুঁটির সঙ্গে ঝুলে পড়তো, যদি না জংলী রাণী বাধা দিতো।
অগ্নিকুন্ডটা আরও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। অগ্নিকুন্ডের লেলিহান শিখার তীব্র তাপ এসে লাগছে তাদের দেহে।
মৃত্যু অনিবার্য জেনে কারো মুখে কোনো কথা নেই।
নূরীর চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে।
সাঁ সাঁ করে বাতাস বইছে।
দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে কয়েকটা প্রাণী।
এখানে জংলিগণ যেমন অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখলো অমনি জংলী সর্দার হাত তুলে বললো—ফুঁলোই হুম্, নাংলো ফুং।
অমনি জংলী রাণী উঠে দাঁড়ালো, মুখমন্ডল দীপ্ত উজ্জল হয়েছে, খুশি হয়েছে বলে মনে হলো।
জংলী সর্দার বললো আবার—লাংলো লুই হুম্....
জংলী রাণী আসন গ্রহণ করলো।
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জংলিগণ ভূতল হতে অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নিলো।
জংলী সর্দার ইংগিৎ করলো, হাত তুলে দেখালো বনহুরকে।
অমনি দুইজন জংলী বনহুরের দিকে এগিয়ে গেলো। সবাই বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে জংলীদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছে। দুইজন জংলী বনহুরের দিকে এগুতেই নূরী আর্তনাদ করে উঠলো—হুর, হুর, ওদের সঙ্গে যেও না হুর!
বনহুর এবার ফিরে তাকালো নূরীর দিকে, কোনো কথা সে বললো না।
সাপুড়ে সর্দার বললো—ওরা বাবুজিকে খুন কইরিবে না মা ফুল। তুই কাঁদিস না।
ততক্ষণে বনহুরের বন্ধন উন্মোচন করে দিয়েছে জংলীদ্বয়। এবার বনহুরকে নিয়ে ওরা মঞ্চের উপরে উঠে গেলো।
নূরী আর্তনাদ করে কাঁদছে—হুর, তুমি যেও না।
হুর..........যেও না ....
বনহুর এসে জংলী সর্দারের সম্মুখে দাঁড়ালো।
জংলী সর্দার হাতখানা বাড়িয়ে দিলো বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর বুঝতে পারলো—তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে চায় জংলী সর্দার। বনহুর হাত রাখলো জংলী সর্দারের হাতের উপর।

এবার জংলী সর্দার বনহুরের হাতের পিঠে চুম্বন করলো। ঠিক পূর্বদিন রাতে জংলী রাণী যেভাবে তার হস্তপৃষ্ঠে চুম্বন করেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো আবার ঢাকের আওয়াজ।

বনহুরকে জংলী সর্দার তার পাশের আসনে বসার জন্য ইংগিত করলো।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

জংলী রাণী তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, দু'চোখে তার আনন্দের দ্যুতি খেলা করছে।

দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালো বনহুর মঞ্চের নীচে যেখানে কাষ্ঠ গুড়ির সঙ্গে পিছমোড়া করে বাঁধা আছে সাপুড়ে সর্দার, কেশব আর নূরী।

নূরী রোদন করছে অবিরত।

বনহুরের প্রাণ বিচলিত হলো, বিশেষ করে নূরীর চোখের পানি তার মনে অস্বস্তি এনে দিচ্ছিলো। বনহুর জংলীদের ভাষা বুঝতেও পারছে না বা বলতেও পারছে না। তবু জংলী সর্দারকে লক্ষ্য করে বনহুর ইংগিৎ করলো ওদের মুক্ত করে দিতে।

কিন্তু জংলী সর্দার মাথা দুলালো—মুক্তি তাদের দেবে না।

বনহুর মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও স্থির হয়ে বসে রইলো। একবার তাকালো সে পাশের জংলী রাণীর দিকে। জংলী রাণীকে খুশি করে তবে ওদের মুক্তি সাধন করতে পারে। নূরী কিছু বোঝে না—এখন নিজকে শক্ত করে নিতে হবে। যেমন করে হোক এদের কবল থেকে মুক্তি চাই।

জমকালো ভয়ঙ্কর চেহারার জংলী সর্দারের পাশে বনহুরকে রাজ কুমারের মতই লাগছিলো। যেন যমদূতের পাশে ফেরেস্তা। বনহুরের গলায় জংলী রাণীর দেওয়া হীরকখন্ডটা থেকে আলোকচ্ছটার মত একটা নীলাভ দ্যুতি বেরিয়ে আসছিলো।

জংলী সর্দার এবার উচ্চারণ করলো—জুপি টং জো হুম্ হুয়াম।

জংলী রাণী উঠে বনহুরের সম্মুখে হাত বাড়ালো।

বনহুর কি করবে ভেবে পায় না, সে জড়গ্রস্তের মত উঠে জংলী রাণীর হাতের উপর হাত রাখলো।

জংলী রাণী বনহুরের হস্তের পিঠে চুম্বন করলো।

আবার শুরু হলো ঢাকের আওয়াজ।

তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে লাগলো সমস্ত জংলী নারী-পুরুষ।

এ যেন এক মহা প্রলয় নাচ।

আনন্দে জংলী দল যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে।

নূরী সাপুড়ে সর্দারকে জিজ্ঞাসা করলো— বাবা, ওরা কি জন্য এমন করছে।

বললো সাপুড়ে সর্দার—বাবুজীর সাথী রাণীজীর বিয়া হবে, তাই উরা খুশি হইয়াছে।

নূরী যেন আর্তনাদ করে উঠলো—জংলী রাণীর সঙ্গে বাবুজীর বিয়ে!

হাঁ ফুল। বাবুজীর সাথী জংলীর বিয়া হলি হয়তো আমরা প্রাণে বাঁচতি পারি।

চাই না বাঁচতে বাবা, ওকে আমি জংলী রাণীর হাতে দেবো না বাবা, আমার বাঁধন খুলে দাও বাবা। খুলে দাও আমার বাঁধন---

নূরীর কণ্ঠ তলিয়ে যায় ঢাকের আওয়াজের তলায়।

কিছুসংখ্যক জংলী-নারী বনফুল নিয়ে ঘিরে ধরে বনহুর আর জংলী রাণীকে, কতকগুলো ফুল ছড়িয়ে দেয় জংলী রাণী আর বনহুরের মাথায়।

এবার নিয়ে যায় জংলী নারীগণ বনহুর আর জংলী রাণীকে মঞ্চের উপর থেকে নামিয়ে।

জংলী রাণীর হাতের মুঠায় তখন বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা ধরা রয়েছে।

জংলী রাণীর সঙ্গে বনহুর চলে যায়।

নূরীর চোখের সম্মুখে নেমে আসে জমাট অন্ধকার। সহ্য করতে পারে না নূরী এই দৃশ্য, ঢলে পড়ে সে কাঠের খুঁটির সঙ্গে।

সাপুড়ে সর্দার লক্ষ্য করে নূরী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। সে অত্যন্ত ভড়কে যায় কিন্তু কি উপায় আছে—তার হাত-পা সব যে খুঁটির সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা।

জংলী সর্দার এবার হাত তুলে বলে—চুল্লুং চুল্লি হুম্।

অমনি ড্রাম ভর্তি কিছু তরল পদার্থ নিয়ে আসে জংলী দল।

জংলী সর্দার মাটির পাত্র ভর্তি করে পান করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য জংলিগণ শুরু করে পান করা।

ঢাক বাজছে।

তার সঙ্গে চলেছে নাচ আর বিকট সুরে অদ্ভুত গান।

কিছুক্ষণ এভাবে নাচ-গান চলে, তারপর দেখা যায় সবগুলো জংলী ভূতলে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে।

মঞ্চের উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জংলী সর্দার। মনে হচ্ছে যেন হস্তীশাবক ঘুমিয়ে পড়েছে।

ওদিকে জংলী রাণী পূর্বদিনের সেই কক্ষে নিয়ে এলো বনহুরকে। জংলী নারীগণ শুধু দরজা পর্যন্তই এগিয়ে দিয়েছে। কাষ্ঠ ফটকের ওপাশে কারো প্রবেশ চলে না।

বনহুরকে জংলী রাণী পূর্বদিনের সেই কক্ষে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। আজও পূর্বদিনের মত কিছু ফল তার সম্মুখে বাড়িয়ে ধরলো।

বনহুর দু'একটা ফল ভক্ষণ করলো।

বনহুর যখন ফল খাচ্ছিলো তখন জংলী রাণী স্থির নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো বনহুরকে।

খাওয়া শেষ হলে বনহুরের সম্মুখে একটি তাজা রক্ত ভরা বাটি বাড়িয়ে ধরলো।

বনহুর মাথা নেড়ে বললো ও সব সে খায় না।

জংলী রাণী বনহুরের মাথার চুলে, গালে, মুখে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলো। দিনের আলো হলেও ভিতরটি বড় অন্ধকার ছিলো, কাজেই গুহার মধ্যে দপ্ দপ্ করে মশাল জ্বলছিলো তখনও।

জংলী রাণী বনহুরের কানের বালা আর হাতের বালা দেখিয়ে কি যেন বললো বুঝতে পারলো না বনহুর, তবু মাথা দোলালো।

হাসলো জংলী রাণী।

এবার বনহুর জংলী রাণীর দেওয়া তার গলার হীরকখন্ডটা দেখিয়ে বললো—এগুলো তোমরা কোথায় পেয়েছো জংলী রাণী?

জংলী রাণী বনহুরের কথার জবাব না দিয়ে শুধু হাসলো, কারণ সে বনহুরের কথা কিছুমাত্র বুঝতে পারেনি।

বনহুর এবার জংলী রাণীর গলার উজ্জ্বল হীরক হার দেখিয়ে বললো—এগুলো কোথায় পেয়েছো?

জংলী রাণী মনে করলো, ওগুলো বুঝি সে তার কাছে চায়। তাই সে নিজের সমস্ত হার, মালা হাতের বালা খুলে বনহুরের গলায় হাতে পরিয়ে দিতে লাগলো।

বনহুর তো হকচকিয়ে গেলো, সে বিভ্রাটে পড়লো। বার বার বললো — না না, ওসব আমি চাই না। নেবো না আমি। তুমি কোথায় পেয়েছো তাই জিজ্ঞেস করছিলাম?

জংলীরাণী তেমনি পূর্বের ন্যায় হাসলো। কারণ সে বনহুরের কথার একবর্ণও বুঝতে পারছিলো না।

বনহুর কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছিলো জংলীরাণী তার কথা বুঝতে না পারায় অসহ্য লাগছিলো তার। বনহুর তার গলা থেকে সব আবার খুলে পরিয়ে দিলো জংলীরাণীর গলায়।

জংলী রাণী তখন বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেলো।

বুঝতে পারলো বনহুর রাগ করেছে। তাই নিজের হার-মালাগুলো পুনরায় খুলে বনহুরের কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলো।

বনহুর নিরূপায়—কিছু বুঝাতে পারে না জংলী রাণীকে সে। বিপদে পড়লো বনহুর, কিভাবে এর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। জংলী রাণীকে কাবু করা তার পক্ষে সামান্য ব্যাপার। কিন্তু জংলী রাণীর যে অসংখ্য অনুচর আছে তাদের কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল। তারা শুধু ভয়ঙ্করই নয়—দুর্দান্ত নরখাদক।

বনহুর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে—তাকে হয়তো সহজে হত্যা করবে না, জংলী রাণীর নজর তার উপরে পতিত হয়েছে, তার সৌন্দর্য জংলী রাণীকেও আকৃষ্ট করেছে কিন্তু আশঙ্কা সাপুড়ে সর্দার, কেশব আর নূরীর জন্য। জংলীরা যদি ওদের হত্যা করে বসে---

বনহুরের চিন্তাজালে বাধা পড়ে, জংলী রাণী বনহুরের কণ্ঠ তার বাহু দুটি দিয়ে বেষ্টন করে ধরেছে। একি! জংলী রাণীর ওষ্ঠদ্বয় তার গন্ড স্পর্শ করেছে। কি তীব্র উষ্ণময় সে ওষ্ঠদ্বয়!

বনহুর মুহূর্তে জংলী রাণীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কঠিন বিরক্তি ভাব ফুটে উঠলো তার চোখেমুখে।

বনহুরের আচরণে জংলী রাণী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত জ্বলে উঠলো তার কালো চোখ দুটো। সেকি জ্বালাময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চোখ দুটো দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। অধর দংশন করে জংলী রাণী।

বনহুর তাকালো জংলী রাণীর মুখের দিকে।

দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বনহুর।

আতঙ্কিত হলো—জংলী রাণীর মুখোভাব সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। এখন কি করা তার কর্তব্য। সাপুড়ে সর্দার কেশব আর নূরীকে বাঁচাতে হবে নিজকেও বাঁচতে হবে। দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো বনহুর। এই মুহূর্তেই হয়তো জংলী রাণী করতালি দিয়ে তার অনুচরগণকে এনে বসবে, হয়তো বা তাকে পুনরায় বন্দী করে নিয়ে যাবে সেই মঞ্চের সম্মুখে। বেঁধে ফেলবে সেই কাষ্ঠ খুঁটির সঙ্গে তারপর হত্যা করবে বল্লম দিয়ে এক একজন করে। বনহুর মৃত্যুর জন্য ভীত নয় কিন্তু এতোগুলো প্রাণ বিনষ্ট হবে! না না, জংলী রাণীকে এভাবে ক্রোধান্ধ করা চলবে না। তাকে খুশি করে তবেই কার্যোদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব! বনহুর পুনরায় তাকায় জংলী রাণীর দিকে।

জংলী রাণী তখন ক্রুদ্ধভাবে অধর দংশন করে চলেছে। সেকি রুদ্র মূর্তি! এত বিপদেও বনহুরের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এবার সে মন স্থির করে নিলো, বাড়িয়ে দিলো দক্ষিণ হাতখানা জংলী রাণীর সম্মুখে।

বনহুর জানতো তার কথা জংলী রাণী বুঝতে পারবে না। সে লক্ষ্য করেছে এদের সন্ধি স্থাপনের কায়দা তাই বনহুর তার দক্ষিণ হাত প্রশস্ত করে দিলো জংলী রাণীর সম্মুখে।

সঙ্গে সঙ্গে জংলী রাণীর মুখমন্ডল খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। হাসির ছটা দেখা দিলো তার মুখে! বনহুরের হাতের উপর হাত রাখলো জংলী রাণী।

বনহুর জংলী রাণীর হস্তপৃষ্ঠে চুম্বন করলো।

❑

সন্তপর্ণে বনহুর উঠে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো জংলী রাণী নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। মশালের আলোগুলো স্তিমিত হয়ে এসেছে। নিভু নিভু মশালের আলোতে জংলী রাণীর কণ্ঠের উজ্জ্বল রত্নাভরণগুলো থেকে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো।

জংলী রাণীর পরিয়ে দেওয়া কয়েক গাছা রত্নহার এখনও বনহুরের গলায় দুলছে। বনহুর নিজের কণ্ঠের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো তারপর তাকালো একবার জংলী রাণীর দিকে। আর এক মূহুর্ত বিলম্ব না করে দ্রুত সুড়ঙ্গ মুখের দিকে অগ্রসর হলো।

প্রথম দ্বারে দু'জন জংলী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিলো। বনহুর আস্তে এসে দাঁড়ালো তাদের পাশে। একসঙ্গে দু'জনার গলা দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরলো। চাপ দিতে লাগলো দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুর কঠিন চাপে অল্পক্ষণেই অবশ হয়ে এলো জংলীদ্বয়ের দেহ। ভূতলে লুটিয়ে পড়লো জংলীদ্বয়। বনহুর এবার আরো দ্রুত চলতে লাগলো।

একটি দ্বার পেরিয়েছে সে।

দ্বিতীয় দ্বার।

এখানে বনহুরকে একটু বেগ পেতে হলো। কারণ পাহারারত জংলীদ্বয় পায়চারী করছিলো। তারা তাদের জংলী রাণীকে সজাগভাবে পাহারা দিয়ে থাকে।

মশালের আলোতে জংলীদ্বয়ের হস্তের বর্শাফলা ঝক্ মক্ করে উঠছে।

বনহুর সুড়ঙ্গ পথের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো। যেমন তার সম্মুখে একজন জংলী অন্যমনস্কভাবে পায়চারী করতে করতে এসে পড়লো অমনি বাম হস্তে টেনে নিয়ে দক্ষিণ হস্তে গলা টিপে ধরলো।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড— জংলীটা মুখ বিকৃত করে ভূতলশায়ী হলো। লোকটার মুখ থেকে একটা গোঙ্গানীর মত শব্দ বেরিয়ে এসেছিলো।

শব্দ শোনা মাত্র দ্বিতীয়জন দ্রুত এগিয়ে এলো।

অমনি বনহুর আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

যেমন জংলীটা তার সঙ্গীর পাশে ঝুকে দেখতে গিয়েছে অমনি বনহুর তাকেও পূর্বজনের মত এঁটে ধরলো। সুড়ঙ্গ মধ্যে চীৎ করে ফেলে বুকের উপর চেপে বসে টিপে ধরলো ওর গলাটা। একটা গোঙ্গানীর মত শব্দ হলো, পরক্ষণেই জিভটা বেরিয়ে এলো এক পাশে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিলো বনহুর।

আর নড়ছে না জংলীটা।

বনহুর বুঝতে পারলো—এরও মৃত্যু ঘটেছে। উঠে দাঁড়ালো এবার বনহুর। আরও একটা দরজা পেরুতে হবে তাকে। সেখানেও আছে দু'জন বল্লমধারী জংলী। তাদের কাবু করে তবেই বের হতে হবে বাইরে পৃথিবীর আলোতে।

বনহুর অতিদ্রুত এবার সুড়ঙ্গ মুখের দিকে অগ্রসর হলো। এবার সে তার নিজের কোমরের ছোরখানা মুক্ত করে নিলো।

খোদাকে ধন্যবাদ দিলো বনহুর কারণ এখনও তার কাছে রিভলভার এবং সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরাটা রয়েছে। অবশ্য সভ্য সমাজের শ্রেষ্ঠ জীবগুলোর হস্তে যদি বন্দী হতো তাহলে সর্বপ্রথম তার নিকট হতে অস্ত্র কেড়ে নিতো তারা। জংলীরা নৃশংস বটে কিন্তু সুচতুর নয় এবং সেই কারণেই এখনও তাদের সঙ্গের সব কিছু সঙ্গেই রয়েছে।

বনহুর সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরাখানা নিয়ে চুপি চুপি সুড়ঙ্গ মুখের অনতিদূরে একটু আড়ালে দাঁড়ালো। কান পেতে শুনলো কোন শব্দ পাওয়া যায় কিনা।

কোনো শব্দ এলো না সুড়ঙ্গমুখ থেকে।

বনহুর সন্তর্পণে এগুতে লাগলো।

একেবারে সুড়ঙ্গমুখে এসে অবাক হলো বনহুর। পাহারাদার জংলীদ্বয় সুড়ঙ্গ মুখের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বনহুর ছোট্ট একটা পাথরের টুকরা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলো একজনের দেহে। আশ্চর্য জংলীটা একটুও নড়লো না।

বনহুর পুনরায় আর একটি পাথরের টুকরা অপরজনের দেহে নিক্ষেপ করলো।

কিন্তু সেও নড়লো না।

তবে কি ওরা নেশা করেছে কিছু! বনহুর সুড়ঙ্গমুখ থেকে বেরিয়ে এলো বাইরে। গাছপালার আড়ালে আত্মগোপন করে অগ্রসর হলো।

সুড়ঙ্গ মুখের অদূরেই কাঠের বিরাট মঞ্চ।

বনহুর বিস্ময়ভরা নয়নে দেখলো মঞ্চের আশে পাশে জংলীদল সব ছড়িয়ে পড়ে আছে। কতকগুলো জংলী মঞ্চের খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে ঢলে আছে। মঞ্চের উপরে কাষ্ঠ আসনের পাশে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে জংলী সর্দার হস্তী শাবকের মত। বনহুর আরও দেখলো প্রত্যেকের সামনে এক একটা মাটির হাড়ির মত বস্তু পড়ে রয়েছে। মঞ্চের অদূরে কয়েকটা বড় বড় ঢোলের মত ড্রাম। সেই সব ড্রামে একরকম তরল পদার্থ রয়েছে। বনহুর এগিয়ে আসতেই একটা উৎকট গন্ধ তার নাকে প্রবেশ করলো। বুঝতে পারলো সে ঐ গন্ধ কিসের। একরকম তালগাছ জাতীয় বৃক্ষ থেকে জংলিগণ এই রস সংগ্রহ করে এবং কোনো উৎসবে পান করে।

বনহুর নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো যাক্ জংলিগণ তাহলে সব মাতাল হয়ে জ্ঞান শূন্য রয়েছে। দ্রুত এগিয়ে গেলো বনহুর কাষ্ঠ খুঁটিগুলোর দিকে।

নিকটে পৌঁছতেই বনহুরের চুক্ষুস্থির হয়ে গেলো। বনহুরের দস্যু প্রাণও শিউরে উঠলো ক্ষণিকের জন্য। যদিও সে একটু পূর্বে চার চারটা জংলীকে হত্যা করেছে তবু এ দৃশ্য তাকে উদভ্রান্ত করে তুললো। দেখলো—তখনও খুঁটির সঙ্গে ঠিক্ পূর্বের মত করে বাঁধা অবস্থায় রয়েছে সাপুড়ে সর্দার কেশব আর নূরী। কিন্তু সাপুড়ে সর্দারের দেহে মস্তক নেই। কি বীভৎস দৃশ্য!

বনহুর দু'হাতে নিজের চোখ দুটো একবার ঢেকে ফেললো। তারপর আবার তাকালো ধীরে ধীরে সাপুড়ে সর্দারের দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। মাথাটা পড়ে আছে ঠিক্ তার পায়ের কাছে। চাপ্ চাপ্ রক্ত জমাট বেঁধে আছে ছিন্ন গলাটার উপর।

বনহুর কেশব আর নূরীর দিকে তাকালো।

ওরা দু'জনাই জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রয়েছে। দু'জনারই মাথাটা কাৎ হয়ে আছে এক পাশে।

বনহুর দ্রুত হস্তে কেশবের বন্ধন উন্মোচন করে দিলো তারপর ঝাকুনি দিয়ে ডাকলো —কেশব---কেশব উঠো--উঠো শীঘ্র---উঠো-- কেশব--- কেশব--

কেশব আস্তে চোখ মেলে তাকালো, পর মুহূর্তে বনহুরকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো—বাবু সর্দারজীকে ওরা কেটে ফেলেছে--রক্ত খেয়েছে ওরা--রক্ত--

হাঁ দেখলাম। কেশব যা হবার হয়েছে, আর বিলম্ব করে কোনো ফল হবে না। ওরা সবাই নেশায় অজ্ঞান হয়ে আছে। এই মুহূর্তে পালাতে হবে! বনহুর কেশবকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দ্রুত নূরীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নূরীর বন্ধন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে কিন্তু নূরীর জ্ঞান ফিরে আসে

না কিছুতেই। ওদিকে জংলীগণের সংজ্ঞা ফিরে এলে আর রক্ষা থাকবে না। তাছাড়া জংলী রাণীও যদি জেগে উঠে তাহলে নিস্তার নেই।

বনহুর নূরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে তুলে নিলো। কেশবকে লক্ষ্য করে বললো—দ্রুত পা চালিয়ে চলো কেশব।

কেশব কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো —বাবু সর্দারের---

তার জন্য দুঃখ করার সময় এখন আর নেই কেশব। তাড়াতাড়ি চলে এসো--বনহুর নূরীর দেহটা কাঁদে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে গহন জঙ্গল মধ্যে আত্মগোপন করলো।

সংজ্ঞাহীন নূরীর দেহটা কাঁধে নিয়ে যতদূর সম্ভব পা চালিয়ে চললো বনহুর। কেশব তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

দূরে—অনেক দূরে চলে যেতে হবে। নাহলে জংলীগণ জেগে উঠলে আর তাদের রক্ষা থাকবে না। সমস্ত বনভূমি চষে ফেলবে জংলীরা।

অনেকটা পথ চলার পর হঠাৎ বনহুর আর কেশবের কানে ভেসে এলো ঢাকের আওয়াজ।

বললো বনহুর—কেশব,সর্বনাশ জংলীরা জেগে উঠেছে। তাদের নেশা ছুটে গেছে--

এখন কি হবে তাহলে বাবু?

জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কেশব, নূরীর জ্ঞান এখনও ফিরে এলো না।

বাবু ফুলের জ্ঞান ফিরে এসেছিলো, কিন্তু যখন সাপুড়ে সর্দারের মাথা কেটে ফেলা হলো তখন আমার চোখ দুটো কেমন যেন মুছে এলো—ঠিক সেই সময় ওর জ্ঞানও চলে গেছে।

হাঁ তাই হবে কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায় বলো?

হঠাৎ কেশব বলে উঠলো—বাবু, ঐ দেখেন সামনে একটা পাথরের ঢিবি চলুন আমরা ঐ ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।

তাইতো ঢিবির মতই লাগছে—চলো দেখা যাক্ কোনো উপায় হয় কিনা।

বনহুর নূরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা নিয়ে অগ্রসর হলো।

কেশব চললো পিছু পিছু।

ঢিবিটার নিকটে পৌঁছতেই আনন্দে বনহুরের মন দুলে উঠলো। ঢিবির ওপাশের বিরাট একটা গর্ত নজরে পড়লো। আপাততঃ এখানে আত্মগোপন করা যায়। গর্তটা বেশ বড়সড়—তিন জনের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

বনহুর নূরীসহ গর্তমধ্যে প্রবেশ করলো।

কেশবও এলো তার সঙ্গে।

নূরীকে গর্তমধ্যে শুইয়ে দিয়ে বনহুর দ্রুত বেরিয়ে গেলো। কেশবও বেরিয়ে যাচ্ছিলো। বনহুর বাধা দিয়ে বললো—তুমি ওর পাশে থাকো, আমি এক্ষুণি আসছি।

কোথায় যাবেন বাবু?

এখানেই রয়েছি যাবো না কোথাও। বনহুর বেরিয়ে গেলো এবং সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা দিয়ে কতকগুলো ডাল পালা ঝোপঝাড় কেটে এনে গর্তটার মুখে চাপা দিলো—যেন বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে।

কাজ শেষ করে বনহুর ফিরে এলো গুহা মধ্যে।

নূরীর সংজ্ঞা ফিরানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো বনহুর।

কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, নূরী আর্তচীৎকার করে উঠলো—উঃ মাগো--মা--মা--

বনহুর ঝুকে পড়লো নূরীর মুখের উপর, ডাকলো—নূরী নূরী---

চোখ মেলে তাকালো নূরী বনহুরকে দেখতে পেলে তার চোখ মুখ আনন্দোদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলো—হুর তুমি এতোক্ষণে এলে?

বনহুর নূরীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললো—নূরী, সুস্থ হও আমরা জংলীদের কবল থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছি।

নূরী উঠে বসলো—সর্দার কই কেশব ভাই কই--এখন আমরা তবে কোথায়? কোথায় বলো?

স্থির হও সব বলছি নূরী এই তো কেশব তোমার পাশে। বনহুর কেশবকে দেখালো। তারপর ধরা গলায় বললো—কিন্তু যে আমাদের পথ প্রদর্শক সেই সাপুড়ে সর্দার আর আমাদের মধ্যে নেই।

এবার নূরীর মনে উদয় হলো সেই দৃশ্য। একজন জংলী খড়গ হস্তে এসে দাঁড়ালো সর্দারের পাশে, আর একজন একটা মাটির পাত্র উঁচু করে ধরলো। মাত্র একমুহূর্ত—সর্দারের মাথাটা খড়গের আঘাতে খসে পড়লো--তারপর আর মনে নেই কিছু। নূরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—বাবুজী মরে গেছে কি হবে আর আমাদের বেঁচে থেকে। ওরা আমাদের সবাইকে কেন হত্যা করলো না! আমাদের বেঁচে থেকে কি হবে হুর?

নূরী, রোদন করার সময় এটা নয়। জংলিগণ এক্ষুণি সমস্ত জঙ্গলময় ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সন্ধান যদি তারা পায় তাহলে আর রক্ষা নেই।

কেশব ক্রন্দনজড়িত ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—কেন আমরা এসেছিলাম! কেন আমরা আগে এসব কথা স্মরণ করিনি এখন কি হবে বাবু?

কেশব, মিছামিছি দুঃখ করা বাতুলতা মাত্র। এখন কি করে প্রাণে বাঁচা যায় সেই চিন্তা করো।

কি করা যায় বাবু ভেবে পাচ্ছি না। ঐ শুনুন জংলীরা বোধ হয় এদিকেই আসছে। কান পেতে শোনে কেশব।

বনহুর আর নূরীও শুনলো—দূরে মহা হই-হুল্লোড় শোনা যাচ্ছে। এখন রাত্রি নয়, দিনের আলো সব পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। বনহুর বললো—এ জায়গাটা সমতল ভূমি থেকে বেশ উঁচুতে। গর্তটাও সহজে কারো নজরে পড়বে না। তাছাড়া আমি গাছপালা দ্বারা গর্তটার মুখ বেশ করে ঢেকে দিয়েছি সহজে কেউ বুঝতে পারবে না এখানে কোনো গর্ত আছে।

হই—হুল্লোড় ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে বলে মনে হলো।

বনহুর বললো—জংলীরা আমাদের সন্ধানে অন্য পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিছুক্ষণের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত।

বললো নূরী—এমন করে কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবো আমরা?

যতক্ষণ কোনো পথ আবিষ্কার না হয়। কেশবকে লক্ষ্য করে বললো আবার বনহুর—কেশব আমরা সাপুড়ে সর্দারের নির্দেশ মত অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। ফিরে যাবার পূর্বে তার সেই গুপ্ত গুহার সন্ধান নিয়ে তবেই যাবো।

নূরী বলে উঠে—কি হবে হুর গুপ্ত গুহার সন্ধান নিয়ে। জীবন যদি হারাতে হয় তাহলে--একি, তোমার গলায় এতোগুলো হীরক হার! এগুলো তুমি কোথায় পেলে?

বনহুর গম্ভীর গলায় বললো—জংলী রাণীর উপহার।

মুহূর্তে নূরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো। জংলী রাণী যখন বনহুরকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো, তখন নূরীর বুকে কে যেন তীর বিদ্ধ করে দিয়েছিলো। নিজকে সে কিছুতেই স্থির রাখতে পারেনি। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো নূরী—জংলী রাণীর উপহার তুমি সযতনে গলায় করে আনছো? না না, ও হার আমি তোমায় পরতে দেবো না---নূরী একটানে বনহুরের কণ্ঠের হীরক হার ছিড়ে ফেললো।

উজ্জ্বল হীরকগুলি ছড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

কেশব বলে উঠলো—একি করলে ফুল? দ্রুতহস্তে হীরক গুলো কুড়িয়ে তুলতে লাগলো সে।

বনহুরের মুখ গম্ভীর হলো।

নূরী বনহুরের জমার আস্তিন চেপে ধরলো—জংলী রাণীর উপহার তুমি কেন গ্রহণ করলে বলো? কেন নিলে এসব?

নূরী মনকে এতো সঙ্কীর্ণ করো না। জংলী রাণীর উপহার গ্রহণ না করে আমার কোনো উপায় ছিলো না।

তুমি—তুমি---

হাঁ হাঁ নূরী—এই নাও এসব তোমার। বনহুর কেশবের হাত থেকে হীরক খন্ডগুলো নিয়ে নূরীর আঁচলে তুলে দেয়।

নূরী পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

❑

জংলীদের কবল থেকে কোনোরকমে আত্মগোপন করে দু'দিন কাটিয়ে দিলো বনহুর কেশব আর নূরী। গর্তটার মধ্যে কোনো অসুবিধা হলো না তাদের।

বনহুর বাইরে গিয়ে ফলমূল সংগ্রহ করে আনতো। কেশব আর নূরীকে কোনো সময় সে বাইরে যেতে দিতো না। হঠাৎ কখন জংলিগণ এদিকে এসে পড়ে—তাহলে কিছুতেই ওদের কবল থেকে বাঁচতে পারবে না তারা।

ইতিমধ্যে জংলীরা আশে পাশে জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে গেছে।

বনহুর আর কেশব গাছপালার পাতা এনে শয্যা তৈরী করেছে। গর্তের একপাশে শোয় কেশব আর বনহুর। অপর ধারে শোয় নূরী।

সমস্ত দিন ধরে পরামর্শ চলে তিন জনের মধ্যে—কেমন করে এখান থেকে পালানো যায়। কিন্তু পালানোর কোনো উপায় খুঁজে পায়না। যে পথেই তারা পালাতে যাবে সেই পথেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। সমস্ত জংগলময় জংলী রাণীর ক্ষুব্ধ অনুচরগণ পাহারা দিয়ে চলেছে।

দিবারাত্র তারা সুতীক্ষ্ণ বল্লম নিয়ে অন্বেষণ করে ফিরছে। এই টিবিটা এমন জায়গায় যেখানে সহজে কারো দৃষ্টি যায় না এবং সেই কারণেই এতোক্ষণও তারা জংলীদের কড়া নজর এড়িয়ে জীবিত রয়েছে।

আজ তৃতীয় দিন।

বনহুর লক্ষ্য করেছে—কেশব আর নূরী যেন হাঁফিয়ে উঠেছে। দুশ্চিন্তায় ম্লান হয়ে উঠেছে তাদের মুখমন্ডল। বিশেষ করে সর্দারের নৃশংস মৃত্যু তাদের দু'জনার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করেছে। বনহুরও সর্দারের মৃত্যুতে কম মর্মাহত হয়নি, কিন্তু বনহুর জীবনে এর চেয়েও বিকৃত মৃতদেহ দেখেছে এর চেয়েও নৃশংস হত্যা সে নিজে করেছে। কাজেই তার মনে সর্দারের মৃত্যু তেমন করে রেখাপাত করতে পারেনি। তাছাড়াও সর্দারের কথা ভাববে কখন সে। তার মস্তিস্কে এখন নানারকম চিন্তার প্যাঁচ চলেছে। জংলীদের মৃত্যু-ছোবল থেকে নূরী ও কেশবকে বাঁচাতে হবে। শুধু জীবন রক্ষাই এখন বনহুরের উদ্দেশ্য নয়। তার প্রবল ইচ্ছা যে অভিসন্ধি নিয়ে তারা এতোদূর অগ্রসর হয়েছে সেই গুপ্তরত্ন গুহার সন্ধান না নিয়ে সে ফিরবে না।

বনহুর বিফল হয়ে ফিরে যাবার লোক নয়।

যতক্ষণ তার অভিসন্ধি সিদ্ধ না হয়েছে ততক্ষণ সে বিরত হবে না। কার্যোদ্ধার করে তবেই সে ক্ষান্ত হবে। সাপুড়ে সর্দার তাকে বলেছিলো— সেই কথাটা আজও মনে আছে বনহুরের--বাবুজী সেই গুপ্তরত্ন গুহার সন্ধান আমি আজও কাউকে বলিনি। আমার ভাতিজা রংলালকে আমি বিশ্বাস করি না, তাই ওকেও বলিনি। বাবুজী আপনাকে আমি ছেলের মতই মনে করি। তাই আপনাকে আমি সেই গুপ্তরত্ন গুহার সন্ধান দিয়ে যাবো। আহা, বেচারা শেষ পর্যন্ত তাকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো না।

রাত বেড়ে আসছে।

বনহুর কেশবের পাশে শুয়ে শুয়ে ভাবছে কত কথা। ঘুম চোখে আসছে না। আজ সর্দারের প্রতিটি কথা মনে উদয় হচ্ছে একটির পর একটি করে। সাপুড়ে সর্দার সেই গুপ্তরত্ন গুহার পথের বর্ণনা বলেছিলো, বলেছিলো সে পথ কেমন। সব বনহুর আজ পুনরায় মনের পর্দায় এঁকে নিচ্ছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

কিন্তু ঘুম যে তার চোখে আসছে না, এ পাশ-ওপাশ করছে বনহুর। পাশেই কেশব ঘুমিয়ে পড়েছে—নাক ডাকছে তার। নূরী ঘুমিয়েছে তার জায়গায়। মাঝখানে মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান। নূরীকে পাশে পাবার জন্য বনহুরের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

অনেক চেষ্টাতেও বনহুর নিজকে সংযত রাখতে পারলো না। কেশবের পাশ থেকে উঠে এগিয়ে গেলো নূরীর পাশে। শিয়রে এসে বসলো বনহুর, অন্ধকারে নূরীর ললাটে হাত রাখলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ছুটে গেলো নূরীর, বললো —কে?

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো—নূরী আমি!

এতো রাতেও ঘুমাওনি কেন?

ঘুম আসছে না আমার চোখে। বনহুর নূরীর মুখখানা তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে।

নূরী বাধা দিয়ে বলে উঠে—ছিঃ কেশব ভাই রয়েছে।

উঁ হুঁ ছাড়বো না তোমাকে।

তোমার পায়ে পড়ি হুর! তোমার পায়ে পড়ি---

নূরী!

হুর আমার লক্ষ্মীটি!

ঘুম যে আমার পাচ্ছে না নূরী।

তুমি শোও আমি তোমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

তোমার কোলে মাথা রেখে শোবো।

বেশ তো শোও।

বনহুর নূরীর কোলো মাথা রেখে শুয়ে পড়লো।

নূরী ধীরে ধীরে ওর চুলের ফাঁকে আংগুল চালাতে লাগলো।

কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো বনহুর।

নূরী ঘুমন্ত বনহুরের চিবুকে ছোট্ট একটা চুম্বন রেখা এঁকে দিয়ে আস্তে আস্তে ওরা মাথাটা নামিয়ে রাখলো নীচে। তারপর নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়লো।

হঠাৎ ঢাকের আওয়াজে ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের, ধড়মড় করে উঠে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে কেশব আর নূরীর নিদ্রাও ছুটে গিয়েছিলো।

বনহুর বললো মৃদু চাপা কণ্ঠে—নিশ্চয়ই এ জংলীদের ঢাকের আওয়াজ।

কেশব ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো—জংলীরা কি এদিকে আসছে?

আমার সেই রকমই মনে হচ্ছে। কারণ ঢাকের আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

তাহলে কি হবে হুর? অন্ধকারে নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে তার বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বললো— ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—ওরা এদিকে আসছে, না ওই পথে অন্য কোথাও যাচ্ছে।

কান পেতে শুনলো ওরা—ঢাকের আওয়াজ অল্পক্ষণেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বনহুর বললো—তোমরা অপেক্ষা করো, আমি বাইরে গিয়ে দেখছি।

নূরী এঁটে ধরলো বনহুরকে—দেহে প্রাণ থাকতে তোমাকে বাইরে যেতে দেবো না।

বনহুর হাসলো, বললো—কতক্ষণ আমাকে ধরে রাখতে পারবে নূরী? জংলী রাণী যদি তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়?

দাঁতে দাঁত পিষে বললো নূরী—যুদ্ধ করবো তার সঙ্গে।

পারবে জংলী রাণীর অনুচরদের সঙ্গে?

না পারি মরবো, তারপর জংলী রাণী তোমাকে নিয়ে যাবে আমার কাছ থেকে---বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে নূরীর কণ্ঠ।

বনহুর নূরীর গন্ডে মৃদু চাপ দেয়, কিছু বলতে যায় সে কিন্তু কেশবের উপস্থিতি তাকে বিরত করে।

কেশব বলে—মশালের আলো না?

বনহুর নূরীকে সরিয়ে দিয়ে গর্তের মুখের কাছে সরে আসে।

সেও দেখতে পায় অসংখ্য মশালের আলো সারিবদ্ধভাবে গহন জঙ্গলে এগিয়ে আসছে। ঢাকের আওয়াজ এখন আরও বেড়ে গেছে চরম

আকারে। বনহুর ভীত না হলেও আতঙ্কিত হলো, নিশ্চয়ই ওরা জানতে বা বুঝতে পেরেছে—এখানে তারা লুকিয়ে আছে।

নূরী আর কেশব প্রায় কেঁদেই ফেললো।

বনহুর ছোরাখানা কেশবের হাতে দিয়েই নিজে রিভলভার প্রস্তুত করে নিলো। বনহুরের চোরা পকেটে এখনও বেশ কয়েকটা গুলী জমা ছিলো।

ক্রমেই মশালের আলো স্পষ্ট মনে হচ্ছে।

দ্রুত যেন আলোগুলো এগিয়ে আসছে। নূরী পুনরায় আঁকড়ে ধরলো বনহুরকে।

কেশবের অবস্থাও শোচনীয়। কাঁপতে শুরু করেছে কেশব।

বনহুর বললো—নূরী মানুষ চিরকাল বাঁচতে আসেনি। কাজেই মরতে যখন একদিন হবেই তখন এতো ভীত হবার কারণ কি? কেশব মরতে যদি চাও তবে বীরের মতই মরবে— দুঃখ কি এতে। সাহস সঞ্চয় করে নাও তোমরা, আমার মনে হচ্ছে—ওরা আমাদের অবস্থান জানতে পেরেছে।

ঢাক—ঢোল বাজিয়ে এভাবে কেন আসছে ওরা? বললো নূরী?

ওটা ওদের নিয়ম। বিশেষ করে জংলীরা যখন রাত্রিতে গহন জঙ্গলে বিচরণ করে তখন জ্বলন্ত মশাল আর ঢাকের আওয়াজ তাদের বন্য হিংস্র জীবজন্তুর কবল থেকে রক্ষা করে থাকে।

কেশব বলে উঠলো আবার —বাবু ঐ দেখুন ওরা প্রায় এসে পড়েছে।

বনহুর বললো—কোনোরকম কথা না বলে চুপ করে থাকতে হবে। যতক্ষণ ওরা আমাদের গুহার ভিতরে প্রবেশ না করে ততক্ষণ আমরা নিশ্চুপ রইবো।

বনহুর আর কেশবের কথাবার্তা অত্যন্ত চাপা স্বরে হচ্ছিলো।

বনহুর, কেশব আর নূরী, অন্ধকারময় গর্তের মধ্যে রইলেও তাদের দৃষ্টি ছিলো অদূরস্থ জংগল মধ্যে।

মশালের আলো অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে।

ভয়ে কুঁকড়ে গেছে নূরী আর কেশব।

বনহুর উদ্যত রিভলভার বাগিয়ে গর্তের মুখে হাঁটু গেড়ে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছে।

সমস্ত বনভূমি যেন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। কানে তালা লাগাবার জোগাড়। মশালের আলোতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বনহুর হঠাৎ চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো—কেশব, আশ্চর্য দেখো দেখো কয়েকজন লোককে ওরা ধরে আনছে না?

কেশব আর নূরী ঢিবির উপর গর্তমুখ হতে তাকালো নীচে বনের মধ্যে। মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখলো—অসংখ্য জংলী দল ঢাক বাজিয়ে মশাল

হস্তে বন্যহস্তীর মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এগুচ্ছে। ওদের মাঝখানে কয়েকজন সভ্য মানুষ রয়েছে বলে মনে হলো।

কেশব বলে উঠলো—বাবু, বাবু এ যে রংলাল দেখছি!

বনহুর তীক্ষ্ণ নজর ফেললো নীচের দিকে—তাইতো, সাপুড়ে সর্দারের ভাতিজা রংলাল। আরও কয়েকজন লোক দেখছি তো সবাইকে ওরা পিছমোড়া করে বেঁধে আনছে।

নূরী যেন খুশি হয়ে বললো—শয়তান রংলালের দল তাহলে জংলীদের হাতে ধরা পড়েছে?

হাঁ নূরী তাই তো দেখছি।

যাক্ ভালো হয়েছে। নূরীর কণ্ঠ খুশি ভরা।

বনহুর বললো—যাক্ খোদার কাছে হাজার শুকরিয়া। এ যাত্রা ওরা আমাদের এদিকে এলো না। ঐ দেখো ওরা ওদের নিয়ে চলে যাচ্ছে। এটা জংলীদের পথ বলে মনে হচ্ছে।

কেশবের এতোক্ষণে যেন কম্প দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলো, সে নিঃশ্বাস নিয়ে বললো—বাঁচলাম বাবু!

নূরীর মুখ অন্ধকারে দেখা না গেলেও বনহুর বুঝতে পারলো সেও অত্যন্ত খুশি হয়েছে। বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে হাঁফ ছেড়ে বললো—উঃ বাঁচলাম এতোক্ষণে।

জংলিগণ তখন রংলালের দলকে বন্দী করে মহা হই-হুল্লোড় এবং ঢাক বাজিয়ে টিবিটার বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। বনহুর নির্বাকভাবে তাকিয়ে দেখছে— যেদিক থেকে জংলিগণ এলো, সেই দিকেই জংলী রাণীর আস্তানা। তবে এরা যাচ্ছে কোথায়?

বনহুর মুহূর্ত চিন্তা করে নিলো—ওরা নিশ্চয়ই কোন নতুন জায়গায় যাচ্ছে, যেখানে হবে তাদের আজ নব উৎসব। বনহুর ওদের অনুসরণ করবে—দেখবে কোথায় যায় ওরা এবং রংলালের দলকে কি করে।

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে দেখছে—ক্রমান্বয়ে জংলীর দল তাদের টিবি ছেড়ে অনেক দূর পিছিয়ে চলে গেলো। মশালের আলোগুলো ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসছে, ঢাকের আওয়াজও অস্পষ্ট লাগছে। বনহুর বললো— কেশব এবার আমাদের এ গর্তের মায়া ত্যাগ করতে হবে।

নূরী আঁতকে উঠলো—কোথায় যাবে তাহলে হুর?

যেদিকে জংলিগণ গেলো।

সর্বনাশ! ওরা আমাদের অবস্থাও সাপুড়ে সর্দারের মত করে ফেলবে। বললো নূরী।

কোনো উপায় নেই নূরী।

তাই বলে ইচ্ছা করে ধরা দেবে জংলীদের হাতে?

কে বলে ইচ্ছা করে ধরা দেবো? দেখতে চাই জংলিগণ বিপরীত পথে কোথায় চলেছে।

কি হবে জংলীদের গন্তব্য স্থানের সন্ধান নিয়ে?

তুমি বুঝবে না নূরী।

কেশব এবার কথা বললো—বাবু জংলীদের পিছু নেওয়া কি আমার ঠিক্ হবে!

সব পরে বলবো্ এখন শীঘ্র তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

নূরী ভীত কণ্ঠে বললো—আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে!

বনহুর বললো—নূরী তুমি না দস্যু দুহিতা ভয় পেলে চলবে কি করে? যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এতোদূর অগ্রসর হয়েছি, যে কারণে আমরা হারিয়েছি আমাদের সাপুড়ে সর্দারকে সেই কাজ সফল না করে কি করে ফেরা যায়!

হুর, তুমি তাহলে গুপ্তরত্ন গুহার সন্ধান না নিয়ে ফিরবে না?

পিছু হটা দস্যু বনহুরের নীতি নয়! গম্ভীর কঠিন কণ্ঠস্বর বনহুরের।

এরপর নূরী আর কোনো কথা বলতে সাহসী হয় না। কারণ বনহুরের কণ্ঠমধ্যে এমন একটা গাম্ভীর্য ফুটে উঠেছিলো যা তার অতি পরিচিত। বনহুরকে সে ভালভাবেই জানে। জানে সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে তখন কাউকে সমীহ করে না। নূরী তাকে যেমন ভালবাসতো তেমনি করতো ভয়। ক্রুদ্ধ হলে সে তখন হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতো, অতি প্রিয়জনকেও সে তখন ক্ষমা করতো না, যদি পেতো তার কোনো অপরাধ। এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্তেও নূরীর মনে পড়লো অনেকদিন আগের একটা ঘটনা। কালু খাঁ তখন জীবিত। একদিন বনহুর দস্যুতা করে ফিরে এলো তাজের পিঠে চেপে। দেহে তার জমকালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, কানে বালা। কোমরের বেল্টে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা, অপর পাশে রিভলভার।

অগণিত অনুচরসহ বনহুর দরবারকক্ষে প্রবেশ করলো। প্রত্যেকটা অনুচরের হস্তে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি।

কালু খাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর।

অনুচরগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সর্দারের সম্মুখে স্তূপাকার করে রাখলো। বনহুরের পিছনে দাঁড়ালো সারিবদ্ধ হয়ে।

বনহুর কালু খাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে কুর্ণিশ জানালো। সমস্ত অনুচরও অনুকরণ করলো বনহুরকে, তারাও কুর্ণিশ জানালো সর্দার কালু খাঁকে।

সেদিন প্রচুর ধনরত্ন আর টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছিলো বনহুর।

কালু খাঁ সন্তুষ্ট হয়ে বনহুরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছিলো সেদিন—বনহুর তুমি দস্যু-নেতা হবার যোগ্য পাত্র বটে। নাও, এই মুক্তার মালা ছড়া তুমি নাও।

বনহুরের লুণ্ঠিত স্তূপাকার মালপত্রের মধ্য হতে একটি মূল্যবান মুক্তামালা তুলে পরিয়ে দিয়েছিলো কালু খাঁ বনহুরের কণ্ঠে।

বনহুর খুশি না হয়ে মুক্তার মালা ছড়া একটানে ছিড়ে ছুঁড়ে দিয়েছিলো দূরে। গম্ভীর দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলো সে—বাপু বনহুর দস্যু বটে কিন্তু লোভী নয়। মুক্তার মালার কোনোই প্রয়োজন আমার নেই।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো কালু খাঁ বনহুরের দিকে।

সমস্ত অনুচরের অন্তর কেঁপে উঠলো। এইবার কালু খাঁ নিশ্চয়ই বনহুরকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু আশ্চর্য, পর মুহূর্তেই কালু খাঁ জড়িয়ে ধরেছিলো বনহুরকে বুকের মধ্যে, বলেছিলো —বেটা তুই শুধু দস্যু নেতাই হবি না, পৃথিবী বিখ্যাত দস্যু হবি তুই। লোভ, মোহ তোকে কোনদিন আকৃষ্ট করতে পারবে না।

আড়াল থেকে সব সেদিন দেখেছিলো নূরী। কালু খাঁর কথায় তার অন্তর ভরে উঠেছিলো। সেদিন দেখেছিলো বনহুরের সাহস, দেখেছিলো কতবড় তার বুকের বল। দস্যু সর্দার কালু খাঁর সম্মুখে সে তার দান উপেক্ষা ভরে বিনষ্ট করতে পেরেছিলো।

আরও কতদিনের কথা নূরীর অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে। বিশেষ করে বনহুরের স্মৃতিগুলো নূরীর মনের আকাশে ধ্রুব তারার মতই চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

বনহুরের সৌন্দর্যেই নূরী শুধু অভিভূত ছিলোনা তার পুরুষোচিত আচরণে বিমুগ্ধ ছিলো সে! বনহুরের আবেগ মাখা কণ্ঠ তাকে যেমন করতো আত্মহারা তেমনি তার পৌরুষভরা কণ্ঠস্বর ওকে করে তুলতো ভীত। বনহুরের সম্মুখে যেতে তখন সাহসী হতো না নূরী।

আজ যখন বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—পিছু হটা দস্যু বনহুরের নীতি নয়। এরপর নূরীর আর কোনো কথা বলার মত দুঃসাহস হলোনা। জানে নূরী—বনহুর যা বলবে তা সে করবে। তাতে যদি তার প্রাণ যায় তবু সে নাছোড়বান্দা।

বনহুর বললো—আর মুহূর্ত বিলম্ব করা ঠিক নয়, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো!

বনহুর উদ্যত রিভলভার হস্তে গর্তমধ্য হতে বেরিয়ে পড়লো।

কেশব আর নূরীও বের হলো তার পিছু পিছু।

নূরীর ওড়নার আঁচলে জংলী রাণীর দেওয়া সেই হীরকখন্ডগুলো রয়েছে। সেগুলো নূরী সযত্নে রক্ষিত করেছিলো আঁচলে।

কেশবের হাতে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

বনহুরের হস্তে রিভলভার।

সম্মুখে বনহুর মাঝখানে নূরী আর কেশব পিছনে।

জংলীদল অনেক দূরে চলে গেছে। তাদের মশালের আলো মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ঘন জঙ্গলের ফাঁকে, আর ঢাকের আওয়াজ এখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

উঁচু টিবিটির গা বেয়ে নেমে আসতে লাগলো বনহুর, কেশব আর নূরী। বনহুর নূরীকে মাঝে মাঝে হাত ধরে সাহায্য করছিলো, কখনও বা কেশব ওকে নামিয়ে নিচ্ছিলো।

অল্পক্ষণেই টিবির পাদমূলে এসে হাজির হলো ওরা তিনজনা।

বনহুর বললো—আমরা অন্ধকারে আত্মগোপন করে জংলীদের অনুসরণ করবো। কেশব,নূরী—এসো তোমরা। আমার মনে হচ্ছে যে পথে জংলীগণ অগ্রসর হচ্ছে সেপথ কোনো গোপন আস্তানার পথ।

কেশব বললো—তাইতো, আমরা যেদিক থেকে পালিয়ে এসেছিলাম ওরা ঠিক তার বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

হাঁ, আমি তাই দেখতে চাই ওরা কোথায় যাচ্ছে। বনহুর কথাটা বলে চলতে লাগলো।

বললো নূরী—রংলালের দলকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

আমার মনেও সেই প্রশ্ন নূরী, আস্তানা ছেড়ে বিপরীত পথে কোথায় চলেছে ওরা কে জানে। কেশব, নূরী—তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আমাকে অনুসরণ করো। হয় কার্যোদ্ধার হবে নয় জংলিদের হাতে প্রাণ যাবে।

উঃ! কি ভীষণ মানুষ তুমি? নূরী চলতে চলতে বললো।

বনহুর বললো—ঘাবড়াবার সময় এটা নয়, কাজেই কথা না বলে নীরবে এসো।

মনে মনে নূরী আতঙ্কিত হলেও কোনো কথা না বলে চলতে লাগলো। জানে সে—কোনো বাধা বিঘ্নই বনহুরকে তার সঙ্কল্প থেকে বিরত করতে সক্ষম হবে না।

ভীষণ জঙ্গলে গভীর রাত্রিতে জমাট অন্ধকারে অত্যন্ত সাবধানে চলতে হচ্ছিলো তাদের। অল্পক্ষণ পূর্বে জংলিগণ ঢাক বাজিয়ে মশাল জ্বালিয়ে চলে গেছে এই পথে, কাজেই হিংস্র জীবজন্তুর তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

জংলীদের মশালের আলো দূরে—অনেক দূরে সরে গেলেও রাত্রির অন্ধকারে বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিলো, তাছাড়া ঢাকের আওয়াজও গুরুগম্ভীর স্বরে ভেসে আসছিলো তাদের কানে।

জংলীদের অনুসরণ করে পথ চলতে কিছুমাত্র অসুবিধা হচ্ছিলো না বনহুরের দলের।

নূরীকে নিয়ে অবশ্য বেশ বিব্রত হচ্ছিলো বনহুর, কারণ সে অন্ধকারে বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। বনহুর আর কেশব তাকে সাহায্য করছিলো।

ধীরে ধীরে জংলীদের মশালের আলো অস্পষ্ট হয়ে আস্ছে। ঢাকের আওয়াজ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো তারা। সেকি দুর্গম পথ! এ পথে মানুষ কখনও চলতে পারে! তদুপরি রাতের অন্ধকার।

অবিশ্রান্ত চলেছে ওরা।

এখন মশালের আলোর ক্ষীণ—রশ্মিও আর নজরে পড়ছে না। ঢাকের শব্দও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

তবু বনহুর, কেশব আর নূরীর চলার বিরাম নেই।

জংলিগণ যে বনহুরের দলের চলার গতির চেয়ে দ্বিগুণ বেশি জোরে চলছিলো তাতে কোনো ভুল নেই। কারণ জংলিদের চলার সঙ্গে পেরে উঠা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য বনহুর যদি একা হতো সে জংলীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গহন বনে আত্মগোপন করে একেবারে পৌঁছে যেতো তাদের অতি নিকটে।

কিন্তু নূরীর জন্যই বনহুর জংলীদের ঠিকভাবে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পারছিলো না।

ওদিকে ঢাকের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না।

ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে ঢাকের শব্দ।

কেশব বললো—বাবু, এখন আমরা কোন্ পথে চলবো? ঢাকের আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছেনা আর?

হাঁ, অসুবিধা হবে এখন, তবু আমাদের যেতে হবে। দেখতে চাই জংলিগণ কোথায় গেলো।

নীরবে অগ্রসর হচ্ছে ওরা।

ঢাকের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

তবে বনহুর অনুমানে চলতে লাগলো যে পথে জংলীদের মশালের আলো অদৃশ্য হয়েছিলো। যেদিকে ঢাকের আওয়াজ মিশে গেছে ঠিক সেই পথ অনুসরণ করে অন্ধকারে এগুতে লাগলো।

বনহুর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছে। যদিও গাঢ় জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে তারা চলেছে তবু বৃক্ষ-লতাপাতার ফাঁকে আকাশের কিঞ্চিৎ অংশ দেখা যাচ্ছিলো।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এলো। ভোরের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাত যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে আত্মগোপন করা মুস্কিল হবে। বনহুর একটু চিন্তিত হলো।

আরও জোরে পা চালিয়ে অগ্রসর হলো তারা।

কিছুটা এগুতেই পুনরায় ঢাকের আওয়াজের ক্ষীণ শব্দ কর্ণগোচর হলো বনহুর, কেশব আর নূরীর।

শিউরে উঠলো নূরী—হুর, জংলিগণ বোধ হয় ফিরে আসছে।

বনহুর আর কেশব কান পেতে শুনতে লাগলো।

কেশব বললো—হাঁ, আমারও ঐ রকম মনে হচ্ছে।

বনহুর বললো—না ওরা ফিরে আসছে না। বোধ হয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঢাক বাজাচ্ছে। যাক্ তবু নিশ্চিন্ত হলাম, এবার আমরা অল্প সময়ে জংলীদের অনতিদূরে পৌঁছতে সক্ষম হবো।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ঢাকের আওয়াজ আরও স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে কানে বাজতে লাগলো।

কেশব আর নূরীর মুখ ভয়ে বিবর্ণ হলেও বনহুরের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হলো।

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর ঢাকের আওয়াজ একেবারে স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো। কিন্তু মশালের আলো দৃষ্টিগোচর হলো না। বনহুর বললো —নূরী, জংলিগণ কোনো গোপন জায়গায় স্থির হয়ে ঢাক বাজিয়ে চলেছে। দেখছো না ঢাকের আওয়াজ একভাবে বেজে চলেছে।

তাইতো ওরা অগ্রসর হচ্ছে না বা ফিরেও আসছে না, তা হলে শব্দ আরও জোরে কানে এসে বাজতো। কিন্তু আমার কেমন যেন ভয় করছে হুর?

এখন মন থেকে ভয়-ভীতি মুছে ফেলো নূরী। কেশব, তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাওনি তাই না?

কেশব ভয় পেয়েছিলো নূরীর মতই কিন্তু বনহুরের এ কথার পর আর সে ভয় প্যাবার কথা বলতে পারলো না। কিছুই না বলে নিশ্চুপ চলতে লাগলো।

আর কিছুটা অগ্রসর হয়েই বনহুর, কেশব আর নূরী আরও বিস্মিত হলো—ঢাকের আওয়াজ এখন তারা একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু

আওয়াজ স্পষ্ট হলেও কেমন যেন অস্পষ্ট ধরনের। মনে হচ্ছে, কোনো পাতালগহ্বর থেকে শব্দটা পৃথিবীর বুকে ভেসে আসছে।

আরও অবাক হলো ওরা তিনজন।

ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে কিন্তু মশালের আলো তো নজরে পড়ছে না।

তবু বনহুর, নূরী আর কেশব অগ্রসর হচ্ছে।

এখন কিন্তু ঢাকের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা গেলেও ঠিক্ বোঝা যাচ্ছে না আর কতদূর বা কোথায় জংলীদল ঢাক বাজাচ্ছে।

হঠাৎ বনহুরের দলের নজরে পড়লো—তাদের অনতিদূরে অন্ধকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এক পর্বতমালা। বনের পশ্চিম দক্ষিণজুড়ে জমাট অন্ধকারের মতই লাগছে পর্বতমালাগুলো।

অন্ধকারেও বনহুরের মুখ উজ্জ্বল হলো, আলো থাকলে নূরী আর কেশব লক্ষ্য করতো বটে, প্রশ্নও করে বসতো নানারকম। এসব প্রশ্নের জবাব বনহুর দিতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু ওরা অন্ধকারে বনহুরের মুখোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারছিলো না, কাজেই নীরবে শুধু অনুসরণ করছিলো তাকে।

সম্মুখে জমকালো রাক্ষসের মত পর্বতমালা লক্ষ্য করে নূরী আর কেশব দাঁড়িয়ে পড়লো।

বললো নূরী—এ যে পর্বতমালা, তবে কি জংলিগণ পর্বতের ওপাশে চলে গেছে?

কেশব বললো—আমারও সেই রকম মনে হচ্ছে বাবু। জংলিগণ নিশ্চয়ই পর্বতের ওপাশে গিয়ে ঢাক বাজাচ্ছে। তাই এমন অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বনহুর বললো এবার—ওপাশে নয় কেশব, জংলিগণ এই পর্বতের ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং সেখানে তাদের উৎসব চলছে।

নূরী অবাক কণ্ঠে বললো— পর্বতের ভিতরে, বলো বনহুর?

হাঁ নূরী, দেখছো না শব্দটা কেমন গুরুগম্ভীর মনে হচ্ছে।

কেশব বললো—মশালের আলো কই? আলো তো নজরে পড়ছে না?

বললাম তো পর্বতের ভিতরে চলে গেছে ওরা। বললো বনহুর।

এমন সময় দূরে মোরগের ডাক শোনা গেলো।

আকাশ ফর্সা না হলেও ভোর হবার লক্ষণ দেখা গেলো।

বনহুর বললো—নূরী, তোমরা এসো, জংলিগণ এখন হয়তো ফিরে যাবার জন্য পর্বতের মধ্য হতে বেরিয়ে আসবে। ওরা বের হবার পূর্বেই আমাদের লুকিয়ে পড়তে হবে। আর বিলম্ব করোনা তোমরা।

নূরী মাটিতে বসে পড়লো —আমি চলতে পারছি না।

সেকি, উঠে পড়ো—এক্ষুণি হয়তো ওরা বেরিয়ে আসবে।

মিথ্যা নয়—বনহুরের কথা শেষ হয় না, হঠাৎ পর্বতের মধ্যে ঢাকের আওয়াজ দ্রুত এবং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

বনহুর নূরীকে একরকম প্রায় টেনে নিয়ে চললো, কেশবও অনুসরণ করলো বনহুরকে। পর্বতের গায়ে আশে পাশে প্রচুর বৃক্ষ-লতা-গুল্ম রয়েছে, আর রয়েছে অসংখ্য ফাটল।

বনহুর নূরী আর কেশবকে নিয়ে লুকিয়ে পড়লো পর্বতের একটি ফাটলের মধ্যে। একি ফাটলটা যেন ভূমিকম্পের মত কাঁপছে। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে নূরী আর কেশবকে লক্ষ্য করে বললো— এখান থেকে চলো নূরী-কেশব। এটাই জংলীদের পর্বতগুহার মুখ বলে মনে হচ্ছে।

সত্যিই ফাটলসহ পর্বতের কিছুটা অংশ যেন দুলে দুলে উঠছে। পায়ের নীচেও ভূমিকম্পের মত কাঁপছে। বনহুর নূরী এবং কেশবসহ দ্রুত ফাটলের বাইরে বেরিয়ে এলো। অমনি ফাটলের মুখটা ভীষণভাবে নড়ে উঠলো।

বনহুর নূরী আর কেশবকে একটানে টেনে নিয়ে ওদিকে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো। ভাগ্য বলতে হবে পাথরের নীচেই একটা মস্ত বড় গর্ত। নূরী আর কেশবকে গর্তের ভিতরে লুকিয়ে দিয়ে নিজে পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো বনহুর।

আশ্চর্য হয়ে দেখলো বনহুর—পর্বতের গায়ে ফাটলটার ভিতর থেকে হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য জংলী দল। মশালের আলোতে বনভূমি আলোকিত হয়ে উঠলো। সকলের হাতে একটি করে মশাল।

জংলিগণ সবাই বেরিয়ে এলো, ঢাক বাজিয়ে যারা চলেছে তারা এখন সকলের পিছন সারিতে। কিন্তু অবাক হলো বনহুর—রংলালের দল এখন তাদের মধ্যে নেই।

বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো কিন্তু জংলিগণ তাকে দেখতে পাচ্ছিলো না। যদিও জংলীদের অবস্থান হতে সে বেশি দূরে ছিলো না।

জংলিগণ আনন্দে আত্মাহারা।

সবাই ঢাক বাজিয়ে এবার ফিরে চললো।

যেমন সারিবদ্ধভাবে সবাই এসেছিলো তেমনি এখনও মিছিল হয়ে চললো। কোনোদিকে নজর ছিলো না ওদের। অবশ্য ওরা জানে এস্থানে তাদের জংলিগণ ছাড়া আর কারো গমন সাধ্য নেই।

জংলিগণ যখন পাথরখন্ডটার একেবারে পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো তখন বনহুর নিজকে গোপন করে রেখেছিলো পাথরের তলায় গর্তের মধ্যে যেখানে নূরী আর কেশব ছিলো। নূরী আর কেশবের অবস্থা মৃতপ্রায়— হঠাৎ যদি জংলীদের দৃষ্টি কোনক্রমে এদিকে আসে তাহলে আর উদ্ধার নেই।

বনহুরের হস্তে রিভলবার ও কেশবের হস্তে সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা যদিও ছিলো তাহলেও অসংখ্য জংলীদের সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের সাধ্য নয়। নৃশংস জংলী দলের হস্তে তীক্ষ্ণ-ধার বল্লাম-বর্শা ও আরও অনেক রকম লৌহ এবং পাথরের অস্ত্র রয়েছে।

রুদ্ধ নিশ্বাসে বনহুর কেশব আর নূরী দেখছে। তাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে মোটা থামের মত কতকগুলো পা চলে গেলো সারিবদ্ধভাবে।

ঢাকের আওয়াজ এবং মশালের আলো স্তিমিত হয়ে আসছে ক্রমান্বয়ে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচালো বনহুর, কেশব আর নূরী।

জংলীদের চলার ধরন অত্যন্ত দ্রুত; কাজেই অল্পক্ষণে জংলীর দল বহুদূরে চলে গেলো।

পাথরের ওপাশের গর্তের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। পূর্বদিকে তখন ফর্সা হয়ে এসেছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ হাওয়া গহন জঙ্গলের জমাট অন্ধকার ভেদ করে একটা শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেলো তাদের সমস্ত দেহে।

পাখীর কলরবে মুখর হয়ে উঠলো বনভূমি।

বনহুর বৃক্ষ-লতা -পাতার ফাঁকে তাকালো আকাশের দিকে। ভোরের আলোতে তার মুখমন্ডলকে দীপ্ত উজ্জ্বল মনে হলো। বনহুর হয়তো দয়াময়ের নিকট লাখ লাখ শুকরিয়া করে নিলো।

নূরীর হাত ধরে বললো বনহুর—এসো তোমরা।

কেশবও অনুসরণ করলো বনহুর আর নূরীকে।

যে ফাটলের মধ্যে থেকে জংলিগণ সারিবদ্ধভাবে বেরিয়ে এসেছিলো সেইদিকে অগ্রসর হলো তারা। বেশিদূর নয়—তাদের অনতি দূরেই সে ফাটলটা।

প্রথম বনহুর নূরী আর কেশবকে নিয়ে এই ফাটলের মধ্যেই লুকিয়েছিলো। সে কল্পনাও করতে পারেনি—এটা পর্বত মধ্যে প্রবেশের একটি সুড়ঙ্গমুখ।

বনহুর নূরী এবং কেশবসহ ফাটলমুখে এসে দাঁড়ালো। ঘন লতা-পাতা আর ছোট ছোট জঙ্গলের ফাঁকে মসৃণ একটা পথ নজরে পড়লো।

প্রভাতের আলো এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৃক্ষাদির ফাঁকে সূর্যের আলো প্রবেশ করছে একটু একটু করে। পাখীরা নীড় ছেড়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ছে।

বনহুর ফাটলটার দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো—পেয়েছি পেয়েছি সাপুড়ে সর্দারের সেই গুপ্তরত্ন ভান্ডারের সন্ধান পেয়েছি।

কেঁশব আর নূরী অবাক হয়ে তাকালো।

বনহুর বললো— সাপুড়ে সর্দার বলেছিলো যেখানে পাশাপাশি পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ—দু'পাশে দুটি ছোট ছোট শৃঙ্গ আর মাঝখানের শৃঙ্গটা আকারে বড় এবং ঠিক গরিলার মস্তকের মত দেখতে। সেটাই রত্নভাণ্ডার গুহার প্রবেশমুখ।

একসঙ্গে কেশব আর নূরী তাকালো সম্মুখস্থ পর্ব্বতমালার দিকে। সত্যিই দু'পাশে দুটো আকারে ছোট শৃঙ্গ আর মাঝখানের শৃঙ্গটা প্রায় আকাশ চুম্বন করছে কিন্তু শৃঙ্গটার উপরিভাগ ঠিক একটি গরিলার মাথার মত।

বনহুর অগ্রসর হলো ফাটলটার দিকে।

জমকালো পাথরের গায়ে শেওলা জাতীয় পদার্থ জমে জমে মাটির স্তর তৈরী হয়েছে, তারই গায়ে নানা জাতীয় বৃক্ষ-লতা-গুল্ম সৃষ্টি করেছে ঝোপজাড় আর জংগল।

ফাটলটার মধ্যে প্রবেশ করলো ওরা তিনজন। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পারলো না। কিছুদূর এগুতেই দেখলো—পাথরের বিরাট একটা চাপ দ্বারা ফাটলের মধ্যকার সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ।

বনহুর থমকে দাঁড়ালো।

কেশব আর নূরীও দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো।

বনহুরের ললাটে দেখা দিলো চিন্তার ছাপ।

কেশব বললো—বাবু, এখন কি করে ভিতরে যাবেন?

জংলীদল যখন এই পথে বেরিয়ে এসেছে তখন নিশ্চয়ই ওপাশে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তোমরা অপেক্ষা করো, আমি চেষ্টা করে দেখি।

নূরী ভীত কণ্ঠে বললো—জংলিগণ যদি হঠাৎ আবার এসে পড়ে?

বললো বনহুর—না এখন ওরা আর ফিরে আসবে না। বনহুর কৌশলে ফাটলের মুখের পাথর বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

খাড়া পিচ্ছিল পাথর বেয়ে উঠা কম কথা নয়। বনহুর অত্যন্ত চেষ্টা করে উঠছিলো। ফাটলের আশে পাশে যে সব আগাছা বা লতা-গুল্ম ছিলো তারই শিকড় আঁকড়ে ধরে কোনোরকমে এগুচ্ছিলো।

নূরী আর কেশব বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো। কি অদ্ভুত কৌশলে বনহুর এগুচ্ছে উপরের দিকে। নূরী জীবনে বনহুরকে বহু অসাধ্য সাধন করতে দেখেছে। আজ যেন সে আরও বেশি আবাক হচ্ছে। নূরী যেমন বিস্মিত হচ্ছিলো তেমনি ভীতও হচ্ছিলো, হঠাৎ যদি পড়ে যায় তাহলে কি উপায় হবে! ফাটলের মুখে পাথরখানা অনেক উঁচু এবং খাড়া। নীচে কঠিন পাথর সমতল নয়, পাথরখন্ডগুলো লাল আকারের ছোট-বড় অনেক রকম।

অতো উঁচু থেকে পড়ে গেলে মৃত্যু সুনিশ্চয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূরী বনহুরকে নেমে আসার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলো। বনহুর কিন্তু তার কথা কানে না নিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। অত্যন্ত পরিশ্রমে নানা উপায়ে কিছুক্ষণেই অনেক উপরে উঠে গেছে বনহুর। সমস্ত দেহ তার ঘামে ভিজে চুপসে উঠেছে। হঠাৎ ফাটলের মধ্যে দেয়ালের গায়ে বিরাট এক অজগর বেরিয়ে এলো। জড়িয়ে ধরলো বনহুরের দেহটাকে অক্টোপাশের মত।

বনহুর কোনোরকম চীৎকার করবার পূর্বেই নূরী আর্তনাদ করে উঠলো— উঃ মা গো সর্বনাশ, হুর---সাপ--হুর--।

কেশব কি করবে, সেও আর্তনাদ করে শুরু করলো—হায় এবার কি হবে কি হবে---বাঁচাও কে কোথায় আছো। কেশব নীচে লাফালাফি করতে লাগলো।

বনহুর এক হস্তে ফাটলের মধ্যের একটা শক্ত করে শিকড় ধরে অন্য হস্তে সাপটার কবল থেকে নিজকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। রিভলভার অবশ্য তার পকেটেই আছে কিন্তু বের করার সুযোগ পাচ্ছে না।

পাথরটার উপরে সর্পরাজের সঙ্গে চললো ভীষণ লড়াই।

নূরী আর কেশব নীচে আর্ত-চীৎকার করে চললো।

নূরী যখন দু'হাতে চোখ ঢেকে আকুলভাবে কাঁদছে তখন হঠাৎ পর-পর দুটো শব্দ হলো, রিভলভারের আওয়াজ —গুড়ুম্ গুড়ুম্। তারপরই উপর থেকে ফোটা ফোটা রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো।

কেশব আর নূরী উপরের দিকে ভয়ার্ত নয়নে তাকালো। দেখলো —বনহুর বামহস্তে একটা শিকড় ধরে দক্ষিণ হস্তে সাপটাকে তার নিজের দেহ থেকে ছাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

নূরী মনে মনে খোদার নাম স্মরণ করতে লাগলো।

অল্পক্ষণেই সাপটা কুন্ডলী পাকিয়ে থপ করে নীচে এসে পড়লো। সেকি বিরাট বিপুলদেহী অজগর সাপ। মাটিতে পড়ে উলোট পালোট করতে লাগলো। রক্তে ভিজে উঠলো পাথরখন্ডের গা গুলো। ঠিক সাপটার বুকের কাছে রিভলভারের পর-পর দুটি গুলী বিদ্ধ হয়েছিলো।

গুলী করার পরই বনহুর রিভলভার পকেটে রেখেছিলো এবং সাপটাকে দক্ষিণ হস্তে শরীর থেকে মুক্ত করে নীচে ফেলে দিয়েছিলো। এতক্ষণে নূরী প্রাণভরে নিশ্বাস নিলো। পা দিয়ে সাপটাকে লাথি দিতে লাগলো সে ক্রুদ্ধ হয়ে।

ঠিক্ সেই মুহূর্তে বনহুরের আনন্দভরা কণ্ঠ শোনা গেলো —পেয়েছি নূরী, পেয়েছি---

বনহুর পাথরের উপরিভাগে উঠে পড়েছিলো সে, ওদিকে নজর করতে দেখতে পেলো—পাথরটার অপর পাশে বড় আকারের একটা চাকার সংযোগ রয়েছে।

বনহুর পাথরটার উপরিভাগে উঠে পড়েছিলো সে ওদিকে নজর করতেই আশায়-আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে চীৎকার করে উঠেছিলো। বনহুর পাথরটার ফাঁক দিয়ে ওদিকে নজর করতেই দেখতে পেয়েছিলো-ওপাশে পাথরটার নীচের দিকে মস্ত বড় আকারের তিনটা পাথরের তৈরী চাকা। এবার বনহুর যেভাবে উপরে উঠে গিয়েছিলো, সেইভাবে দ্রুত নেমে এলো নীচে।

বনহুর বললো—কেশব, এবার এ পাথরখানা সরিয়ে ফেলার কৌশল জানতে পেরেছি। বনহুর কথা শেষ করে পাথরখানার পূর্ব ধারে গিয়ে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিতে লাগালো। না, একটুও নড়লো না পাথরটা। বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠলো। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে বার বার ধাক্কা দিচ্ছে সে। কেশবও সাহায্য করতে লাগলো তার দেহের সমস্ত বল দিয়ে কিন্তু একচুল নড়লো না পাথরখানা।

বনহুর এবার গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে লাগলো। যা হোক, বেশিক্ষণ বিলম্ব করাও সমাচীন নয়। হঠাৎ যদি জংলিগণ এসেই পড়ে তাহলে আর নিস্তার নেই। মরতেই হবে তখন।

বনহুর একটা পাথরখন্ডে বসে ভাবতে লাগলো।

নূরী এসে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো। কেশবের উপস্থিতিতে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো নূরী। নিজের ওড়নার আঁচলে বনহুরের মুখের এবং গন্ডের ঘাম মুছে দিতে লাগলো।

একটু বিশ্রাম করে নিয়ে বনহুর উঠে পড়লো, পাথরটার চারিদিকে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো সে। হঠাৎ বনহুরের চোখেমুখে খুশি উপচে পড়লো, এবার বনহুর বুঝতে পেরেছে কি ভাবে এ পাথরটা সরানো যাবে। পাথরটার ঠিক্ পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে চাপ দিতেই ধীরে ধীরে সেটা একপাশে সরে যেতে লাগলো।

পাথরখন্ডটা সরে যেতেই পর্বতমালার মধ্যে বেরিয়ে এলো একটা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। বনহুর অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে উঠলো—হুররে,. পেয়েছি পেয়েছি, সাপুড়ে সর্দারের সেই ভান্ডারের গুহা-- বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডলে খুশি যেন উপচে পড়ছে। ওষ্ঠদ্বয় হাসিতে স্ফীত হয়ে উঠেছে। দু'চোখে করে পড়ছে একটা অদ্ভুত দ্যুতি।

বনহুর নূরী এবং কেশবসহ সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হলো।

সুড়ঙ্গপথে চলতে গিয়ে তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না। তবে অন্ধকারটা ক্রমেই গাঢ় হয়ে আসছে। বনহুরের হাতের মুঠোয় নূরীর হাত।

কেশব পিছনে তাকে অনুসরণ করছে।

সুড়ঙ্গমুখ ছেড়ে যতই ওরা ভিতরে প্রবেশ করছিলো ততই পৃথিবীর আলো নিভে আসছিলো। সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে যতটুকু আলো আসছিলো এটুকু আলোই ছিল তাদের সম্বল। জংলিগণ মশাল হস্তে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করে— তাই তাদের পৃথিবীর আলোর কোনো প্রয়োজন হয় না।

সুড়ঙ্গপথটা কিছুদূর অগ্রসর হয়েই বাঁদিকে মোড় ফিরেছে। বনহুর, নূরী এবং কেশব বামদিকে সুড়ঙ্গপথ ধরে কিছুটা এগুতেই আলোর ছটা তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। বনহুর বললো—মশালের আলো।

কেশব আর নূরী আঁতকে উঠলো, ভীত কণ্ঠে বললো—জংলীদের লোক এখনও আছে এখানে?

দেখা যাক। বনহুর রিভলভার বের করে গুলী ভরে নিলো। বনহুরের চোরা পকেটে এখনও বেশ কয়েকটা গুলী মজুত আছে। সে আসবার সময় কিছু গুলী তার চোরা পকেটে লুকিয়ে নিয়েছিলো।

বনহুর সন্তর্পণে সম্মুখে এগুতে লাগলো।

তার পিছনে নূরী এবং কেশব।

বনহুরের হস্তে গুলী ভরা রিভলভার, কেশবের হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। নূরীও তার খোঁপার ভিতর দেহরক্ষী ছোরাখানা বের করে নিলো।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো বনহুর। কেশব আর নূরী তাকে অনুসরণ করছে।

এখানে সুড়ঙ্গ বেশ কিছুটা প্রশস্ত কিন্তু এদিকে ওদিকো তেমনি জমাট অন্ধকার। মশালের আলোরছটা আসছে বেশ কিছুটা দূর হতে।

বনহুর নূরী আর কেশব আলোর ছটা লক্ষ্য করে সেদিকে এগুতে লাগলো। বিরাট গুহা, যেন একটা প্রাসাদ। পর-পর কয়েকটা সুড়ঙ্গমুখ রয়েছে প্রত্যেকটা সুড়ঙ্গমুখে এককালে লৌহ কপাট ছিলো বলে মনে হচ্ছে— এখন অবশ্য লৌহ কপাটের কিছু কিছু ভগ্ন অংশ দেখা যাচ্ছে।

বনহুর যত এগুচ্ছে ততই তার বিস্ময় বাড়ছে।

এখন তারা আলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। গুহার ঠিক মাঝখানে নজর পড়তেই নূরী দু'হাতে চোখ ঢেকে আর্তচীৎকার করে উঠলো।

বনহুর আর কেশব দেখলো—সুড়ঙ্গ মধ্যে ঠিক্ মাঝখানের প্রশস্ত একটি জায়গায় কয়েকটা মস্তকহীন মৃতদেহে ঝুলছে। পা উপরের দিকে মাথাটা ঠিক্ নীচের দিকে ঝোলানো। প্রত্যেকটা মৃতদেহর নীচে এক একটি মাটির

গামলা দেওয়া রয়েছে। কিন্তু গামলায় রক্ত নেই সামান্য কিছু রক্ত তখন গামলাগুলোর তলায় জমাট বেঁধে আছে।

বনহুর ফিরে তাকালো —নূরীর দিকে—নূরী ঢলে পড়ে যাচ্ছিলো, ধরে ফেললো বনহুর।

কেশব ভয়ার্তস্বরে বললো—বাবু এ যে দেখছি---কথা শেষ না করে কাঁপতে থাকে কেশব ঠক্ ঠক্ করে।

বনহুরের হাতের উপর নূরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা এলিয়ে পড়েছে। বনহুর বললো—হাঁ কেশব তোমার অনুমান ঠিক এই যে মৃতদেহগুলো দেখছো এগুলো রংলালের দলের। ঐ দেখো মাঝখানের মস্তকহীন দেহটা রংলালের বলে মনে হচ্ছে।

কেশব ভীত নজরে তাকিয়ে বললো—হাঁ বাবু, ঐ তো রংলালের দেহ। বাবু জংলীরা ওদের অমনভাবে কেটে ফেলেছে কেন?

জংলীরা ওদের মস্তক কেটে রক্ত পান করেছে। ঐ দেখছো না প্রত্যেকটা মৃতদেহের নীচে মাটির গামলা দেওয়া রয়েছে।

দেয়ালে কতকগুলো মশাল পোতা রয়েছে তারই আলোতে সব স্পষ্ট দেখাচ্ছিলো।

বললো বনহুর—কেশব, জংলিগণ আজ এখানে নর-রক্ত পান করে উৎসব পালন করেছে।

পর-পর কাষ্ঠখণ্ডে মৃতদেহগুলো ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেকটা দেহের অদূরে তাদের ছিন্ন মস্তক পড়ে আছে। সেকি বীভৎস দৃশ্য! কেশব কিছুতেই এ দৃশ্য সহ্য করতে পারছিলো না, সে দু' হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো। নূরীর অবস্থা আরও সঙ্কটময়, সংজ্ঞাহীন নূরীর দেহটা এখনও বনহুরের বাহুর মধ্যে আবদ্ধ।

বনহুর স্থিরভাবে তাকিয়ে দেখছে জংলীদের নৃশংস হত্যার শেষ পরিণতি। রংলালের দলে ছিলো কয়েকজন তার মধ্যে একজন ব্যাঘ্র কবলে প্রাণ দিয়েছে। আর বাকীগুলোর শেষ পরিণতি জংলীদের হাতে হয়েছে। কঠিন প্রাণ বনহুরের—তবু সে কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লো।

বনহুর নূরীকে নিয়ে সরে গেলো সেখান থেকে।

কেশব অগত্যা বনহুরকে অনুসরণ করলো।

কিছুটা এগুতেই দেখলো ওদিকে একটা উঁচু ঠিক আসনের মত জায়গা। বনহুর নূরীকে শুইয়ে ওর মাথাটা তুলে নিলো কোলে, বার বার ডাকতে লাগলো—নূরী, নূরী, নূরী---

অল্পক্ষণ পর নূরী চোখ মেলে তাকালো।

বনহুর বললো—নূরী, শক্ত হতে হবে। এতো সহজে, এতো সামান্যে সংজ্ঞা হারালে চলবে কি করে? উঠো নূরী, তুমি না দস্যু বনহুরের সঙ্গিনী।

নূরী চারিদিকে ভয়ার্ত নজরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো পরে কম্পিত কণ্ঠে বললো—মৃতদেহগুলো কার বনহুর?

সে পরে শুনো এখন উঠো দেখি। বনহুর নূরীকে উঁচু করে তুলে ধরলো এবং নূরীসহ দাঁড়াতে চেষ্টা করলো।

বনহুরকে ধরে উঠে দাঁড়ালো নূরী। কিছুক্ষণে সুস্থ হয়ে উঠলো সে।

নূরীকে এবার মৃতদেহের দিকে না নিয়ে অন্যদিকে এগুলো বনহুর। হঠাৎ তার নজর চলে গেলো অদূরে—দেখলো কতকগুলো লৌহ সিন্দুক স্তরে স্তরে সাজানো। সিন্দুকগুলোর প্রত্যেকটার গায়ে শিকল আটকানো রয়েছে।

বনহুর কেশব আর নূরী দ্রুত অগ্রসর হলো।

বনহুর একটা মশাল তুলে নিলো হাতে। মশালগুলো জ্বলে জ্বলে প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছিলো। জংলিগণ চলে যাবার সময় কতকগুলো মশাল রেখেই গিয়েছিলো।

মশাল হস্তে বনহুর লৌহ সিন্দুকের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। বনহুরের চোখ দুটো যেন দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

লৌহ সিন্দুকের ডালা খুলে ফেললো বনহুর। অমনি মশালের আলোতে সিন্দুকের মধ্যস্থ বস্তুগুলো থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো। চোখ ঝলসানো নীলাভ আলোকরশ্মির মত ছটা।

বনহুরের মুখে হাসির আভাষ ফুটে উঠলো।

নূরী আর কেশব ভুলে গেলো বীভৎস মৃতদেহগুলোর কথা। মন থেকে ভয় যেন মুছে গেলো মুহুর্তে। নূরী দু'হাতে যতটুকু আঁচল ভরে তুলে নিয়ে উচ্ছল কণ্ঠে বললো—হুর, এ যে মনি-মুক্তা আর হীরে। মনি-মুক্ত-হীরে আঁচল ভরে নিতে লাগলো নূরী।

হেসে বললো বনহুর—সবই এখন তোমার। কত নেবে নূরী নাও।

বনহুর দ্বিতীয় সিন্দুকটা খুলে ফেললো এবার।

নূরী আর কেশবের চোখে বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগলো। বনহুরের আস্তানায় বহু ধন-রত্ন মনি-মুক্তার অলঙ্কার আছে কিন্তু এতো তো নেই। লুট করে যা নিয়ে আসে বনহুর তা তো জমিয়ে রাখে না সে বিলিয়ে দেয় দীনহীন গরীবদের মধ্যে। আজ একসঙ্গে এতোগুলো মনি-মুক্তা আর হীরক অলঙ্কার দেখে বনহুরের চোখেও বিস্ময় জাগে।

কেশব তো হতভম্ব হয়ে গেছে।

বনহুর পর-পর কয়েকটা সিন্দুক খুলে দেখে নিলো। সবগুলো মনি-মুক্তা আর হীরে-সোনা-দানায় পরিপূর্ণ। সর্বশেষ দুটো সিন্দুক খুলে ফেলার সঙ্গে

সঙ্গে হতবাক হলো বনহুর। অবাক হয়ে দেখলো—এ দুটো সিন্দুকে শুধু রয়েছে স্বর্ণ মোহর। অদ্ভুত ধরনের এ মোহরগুলো।

বনহুর একটা মোহর তুলে নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ উল্টে দেখে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—শত শত বছর পূর্বের এ মোহর।

কেশব আর নূরীও হাতে তুলে নিলো, অবাক হয়ে দেখতে লাগলো—মোহরে কোনোরকম সন-তারিখ নেই, শুধু ভয়ঙ্কর জীবজন্তু আর অদ্ভুত সব মূর্তি আঁকা রয়েছে। বনহুর গুহার মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো। এক একটা কামরার মত ছোট-বড় অনেক গুহা রয়েছে। পর্বতমালার মধ্যে যে এমন ফাঁকা আর অনেকগুলো গুহা পাশাপাশি থাকতে পারে বিস্ময়কর ব্যাপার।

বনহুর তার নিজের আস্তানা তৈরী করেছে কৌশলে নানা পদ্ধতিতে অত্যদিক বিস্ময়করভাবে কিন্তু এ গুহা যে তার চেয়েও বিস্ময়কর। পাথর কেটে কেটে তৈরী করা হয়েছে, দুর্গম সুড়ঙ্গ পথ আর বিভিন্ন ধরনের গুহা। হঠাৎ গুহার মধ্যে প্রবেশ করতেই বনহুর চমকে উঠলো। এ গুহাটা জমাট অন্ধকার এবং অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ। মাকড়সার জাল আর নানারকম পোকামাকড়ের ভীড়। মানুষের সাড়া পেয়ে বড় বড় মাকড়সাগুলো জাল বেয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো।

বনহুরের হস্তে তখনও মশাল ছিলো। মশালের আলোতে সে দেখতে পেলো এক একটা মাকড়সার চোখ যেন মশালের আলোতে জ্বলছে। কেমন যেন কটমট করে তাকাচ্ছে ওরা। অন্ধকার গুহার প্রেত আত্মার মতই লাগলো।

বনহুর মশাল উঁচু করে এগুতেই মাকড়সা এবং অন্যান্য জীবজন্তুগুলো সরে যেতে লাগলো। বনহুর মশালের আলোতে এবার গুহাটার মেঝেতে নজর ফেললো। চমকে উঠলো বনহুর—অসংখ্য লৌহ-অস্ত্র স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। যদিও সেগুলো মরচে ধরা এবং অযত্নে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে—সেগুলো বহু পুরোনকালের অস্ত্রশস্ত্র। বনহুর অবাক হয়ে এসব অস্ত্র দেখতে লাগলো। যতই দেখছে ততই যেন দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় জাগছে। আরও কিছুটা এগুলো সে মশাল উঁচু করে দেখতে লাগলো সে। বুঝতে পারলো বনহুর—এই গুহাটি সম্পূর্ণ কোনো দস্যুর আস্তানা ছিলো। মারাঠা জলদস্যুদের আস্তানা হবে। বনহুর স্তূপাকার অস্ত্রগুলোর পাশে হাটু গেড়ে বসে পড়লো। মরচে ধরা অস্ত্রগুলো হাতে তুলে নিয়ে দেখতে লাগলো অবাক হয়ে।

এমন সময় নূরী কোঁচড়ে এক গাদা মনি মুক্তা আর হীরক নিয়ে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো কেশবও এসে পড়লো নূরীর সঙ্গে।

নূরী বললো—বনহুর কি দেখছো? এগুলো কি?

বনহুর অস্ত্রগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখতে দেখতে বললো—এগুলো অস্ত্র।

অস্ত্র!

হ্যাঁ নূরী বহু বছর আগের অস্ত্র এগুলো। দেখছো না মরচে ধরে কেমন জিরজিরে হয়ে গেছে।

কেশব ততক্ষণে মরচে ধরা জরাজীর্ণ অস্ত্রগুলো হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো সে—এগুলো কি ধরনের অস্ত্র বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু?

বনহুর বললো—বহুদিন পূর্বে এ ধরনের অস্ত্রই ব্যবহৃত হতো। কোনো মারাঠা জলদস্যুর আস্তানা ছিলো এ গুহা। এসব অস্ত্র এবং ধনরত্ন সবই সেই দস্যুদের।

বললো কেশব—তাহলে জংলীরা এখানে কি করে সন্ধান পেলো?

বহুকাল আগের এ গুহা দস্যুদের অস্তিত্ব মুছে যাবার পর জংলীদের কবলে এসে গেছে বলে মনে হচ্ছে। উঠে দাঁড়ালো বনহুর আরও ভিতরের দিকে এগুতে লাগালো সে। নূরী হাত চেপে ধরলো বনহুরের —না না, যেও না ওদিকে।

বনহুর বললো—সব কিছু আমি দেখতে চাই নূরী।

আমার গা কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

কেশবের মুখে কোনো কথা নেই।

বনহুর হেসে বললো—মৃত্যুগহ্বরে এসে মৃত্যুকে ভয় করলে চলবে কি করে? এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর নূরী আর কেশবসহ অগ্রসর হলো। দক্ষিণ হস্তে তার জ্বলন্ত মশাল রয়েছে।

মানুষের সাড়াশব্দ পেয়ে নানারকম জীব এদিক-সেদিক ছুটে পালাতে লাগলো। মাকড়সা, বাদুড়, বিছা অগণিত রয়েছে। কিছুটা এগুতেই একটা সাপ ফোঁস করে উঠলো।

নূরী আর্তনাদ করে বনহুরকে আঁকড়ে ধরলো।

বনহুর মশাল উঁচু করে বাড়িয়ে ধরতেই সাপটা সরে গেলো ওদিকে।

মাকড়সাগুলোর চোখ দেখে নূরী ভীত হলো, বললো—ওগুলো কামড়ে দেবে হুর।

কেশব বললো—বাবু আর না যাওয়াই ভাল। এ সব গুহায় মানুষ আসে না।

নূরী বললো—হুর জংলিগণ তাহলে এসব দিকে আসে না বুঝি?

হাঁ, ওরা এসব গুহায় আসে না বা দেখেনি বলেই মনে হয়। জংলিগণ সম্মুখে যা দেখেছে বা পেয়েছে তাই নিয়েই খুশি হয়েছে। এসব দেখার মত সখ তাদের নেই।

কি হবে এসব দেখে বলো তো? আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে। কথাগুলো বলে নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে এগুতে লাগলো।

ওদিকে কিছুটা অগ্রসর হতেই বনহুর থমকে দাঁড়ালো। সম্মুখে একটা বিরাট পাথর পথ রোধ করে পড়ে আছে। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো পাথরটার নীচে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগলো, দেখলো পাথরের নীচে চাপা পড়ে আছে কতকগুলো কঙ্কাল। কারো বা মাথা ভিতরে —শুধু অর্দ্ধেকটা বাইরে, আর কোনটার সম্মুখভাগ বাইরে—পিছন দিকটা ভিতরে।

বনহুর অবাক চোখে দেখছে। ভাবছে, ব্যাপার কি —এমন কেন! হাঁটু গেড়ে বসে একটা কঙ্কালে হাত দিলো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালের হাড়গুলো ঝরে গুঁড়ো হয়ে খসে পড়লো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর বললো —নূরী, ওপাশে আমাকে যেতে হবে।

ওপাশে? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো বনহুর।

হাঁ এই পাথরের চাপটার ওপাশে আমি যেতে চাই।

সর্বনাশ, ওপাশে কি করে যাবে তুমি?

যাওয়াটা অত্যন্ত অসম্ভব নূরী, কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। আমি দেখতে চাই ওপাশে কি আছে।

আচ্ছা লোক তুমি হুর, দেখছো মানুষের কঙ্কাল চাপা পড়ে আছে? নিশ্চয়ই ওপাশে ভয়ঙ্কর কোনো বিপদ ওৎ পেতে আছে।

বিপদ ---- হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে উঠলো বনহুর। সে ভয়ঙ্কর হাসির শব্দে অন্ধকার গুহা থর থর করে যেন কেঁপে উঠলো।

কেশব আর নূরীর অন্তর শিউরে উঠলো।

ভয়ার্ত চোখে তাকালো ওরা বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর মশালটা কেশবের হাতে দিয়ে পাথরটার পাশে এসে দাঁড়ালো। ভীষণভাবে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। হঠাৎ নড়ে উঠলো পাথরটা, সঙ্গে সঙ্গে কাৎ হয়ে পড়লো এক পাশে।

ভাগ্যিস কেশব আর নূরী সরে গিয়েছিলো সেখান থেকে। পাথরটা ঠিক ঐ জায়গায় এসে গড়িয়ে পড়লো যেখানে একটু পূর্বে কেশব আর নূরী দাঁড়িয়েছিলো।

পাথরটা সরে যেতেই একটা পথ বেরিয়ে এলো। একটা জমাট অন্ধকার গুহা। পাথরটা সরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্যাপ্‌সা গ্যাসের মত গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত গুহাটার মধ্যে।

বনহুর, কেশব এবং নূরী একসঙ্গে নাকে হাত চাপা দিলো। মাথা কেমন যেন ঝিম ঝিম করতে লাগলো তাদের। কিছুক্ষণ লাগলো তাদের সামলে নিতে।

বনহুর বললো—বহুদিন ঐ গুহায় হাওয়া প্রবেশ না করায় এই গ্যাস সৃষ্টি হয়েছে।

অপেক্ষা করলো বনহুর কিছু সময়, তারপর নূরী এবং কেশবের বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রবেশ করলো সেই বদ্ধ গুহায়।

বনহুরের হস্তে তখন মশাল রয়েছে।

সেই বদ্ধ গুহায় প্রবেশ করতেই বনহুর বিস্ময়ে স্তব্দ হয়ে পড়লো। এ গুহাটা সবচেয়ে বড় এবং প্রশস্ত। কিন্তু মেঝেতে নজর করতেই আড়ষ্ট হলো সে, অগণিত নর-কঙ্কাল গুহার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ে আছে। যদিও নানারকম ময়লায় কঙ্কালগুলো ঢাকা পড়ার জোগাড় হয়েছে তবু বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—কঙ্কালগুলো মানুষের ছাড়া আর কিছুর নয়।

বনহুরের ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠলো। এই বদ্ধ গুহায় এতোগুলো নরকঙ্কাল' এক সঙ্গে কেন? তাছাড়াও কিছু সংখ্যক নরকঙ্কাল সম্মুখস্থ পাথরখন্ডটার তলায় চাপা পড়ে থাকতে দেখলো সে। এবার বনহুর চারিদিকে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো যে, গুহার মধ্যে এখন বনহুর দাঁড়িয়ে আছে এটা কোনো দরবার কক্ষ হবে। কিন্তু এতোগুলো লোক কিভাবে মারা পড়েছিলো বোঝা মুস্কিল।

গভীরভাবে বনহুর চিন্তা করতেই বুঝতে পারলো মারাঠা দস্যুগণ হয়তোবা এই গুহা মধ্যে বসে শলা-পরামর্শ করছিলো কিংবা দরবার বসেছিলো তাদের, হয়তো ঠিক সেই সময় সহসা কোনো দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে দস্যুদল সেখানেই অঘোরে প্রাণ হারায়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বনহুর। বহুদিন পূর্বের একটি দস্যুদলের স্মৃতি ভেসে উঠে তার মানসপটে। সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দলপতি, ভীমকায় বিরাটদেহী এক পুরুষ।

দুচোখে তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। সম্মুখে দন্ডায়মান অগণিত দস্যু। সবাই স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে দলপতির দিকে। দলপতি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তার অনুচরদের প্রতি আদেশ দান করছে।

মনোযোগ সহকারে শুনছে অনুচরগণ। ঠিক সেই মুহূর্তে ভীষণ!

কোন দৈব বিপর্যয়ে একসাথে প্রাণ হারায় দস্যুদল। হায়রে জীবন!

চিরদিনের সঞ্চিত রত্ন ভান্ডার ত্যাগ করে চলে যেতে হলো!

বনহুর আনমনা হয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ নূরীর করুণ কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে আসে তার।

নূরী ডাকে—বনহুর, শ্রীঘ্র এসো,জংলীরা এসে পড়বে। এসো, তোমার পায়ে পড়ি হুর, শ্রীঘ্র এসো তুমি.....

বনহুর আর বিলম্ব না করে ফিরে আসে দ্রুত নূরী আর কেশবের পাশে। আর এখানে দেরী করা মোটেই উচিত নয়।

বনহুর নূরী এবং কেশব ফিরে আসে রত্না ভরা সিন্দুকগুলোর পাশে।

বনহুর বলে এবার—নূরী এসব তুমি নিতে চাও?

হাঁ নিতে চাই হুর। কিন্ত আমি অবাক হচ্ছি, তুমি আমাকে এ প্রশ্ন করলে কেন? তুমি কি এ সব চাও না?

হেসে বললো বনহুর— এ সব নিয়ে কি হবে নূরী? এ সবে কিইবা প্রয়োজন আমার?

এ তুমি কি বলছো হুর?

ঠিকই বলছি।

তবে এত করে কেন এলে এখানে? সাপুড়ে সর্দারের জীবনই বা গেলো কেন? আর......

বেশ চলো, কত নিতে চাও নাও।

কেশব বললো—সিন্দুকগুলোসহ নিয়ে যাওয়া যায় না কি?

যায়, কিন্তু নেবে কেমন করে? গহন জঙ্গলে যানবাহন তো আর নেই। তাছাড়া ওগুলো যৎসামান্য ভার নয়, প্রায় অনেক ওজন হবে।

নূরী তখন আঁচলে যা নিয়েছিলো সেগুলো আরও ভালভাবে পুটলী করে বাঁধতে থাকে।

কেশব তার জামাটা ভূতলে পেতে যতটুকু ধরে নিতে থাকে।

বনহুর তখনও গুহামধ্যে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছিলো।

যতই দেখছে ততই যেন ওর দেখার বাসনা জাগছে। কত দিন আগের কতরকম স্মৃতি জড়িয়ে আছে এসব গুহার মধ্যে। বনহুর এবার গুহার পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলো। অনেকটা এগিয়ে গেছে বনহুর—এমন সময় একটা শব্দ ভেসে এলো তার কানে। কান পেতে স্থির হয়ে দাঁড়ালো বনহুর। অল্পক্ষণ শোনার পর বুঝতে পারলো, নিকটেই কোথাও জলপ্রপাতের শব্দ এটা। বনহুর আরও দ্রুত এগুতে লাগলো।

ওদিকে একেবারে গুহার শেষ প্রান্তে গিয়ে বনহুর চমকে দাঁড়ালো। স্পষ্ট দেখলো—একটা সুড়ঙ্গমুখ রয়েছে সেখানে এবং সেই মুখে লৌহকপাট আটকানো আছে।

বনহুরের মুখ খুশিতে দীপ্ত হলো, এদিকে যে এমন একটা গোপন পথ আছে, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। বনহুর দৃঢ় হস্তে জিরজিরে লৌহকপাটে ঝাঁকুনি দিলো। লৌহকপাট হলেও অনেক দিনের অব্যবহারে মরচে ধরে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিলো। বনহুরের দৃঢ়হস্তের ঝাকুনিতে খসে পড়লো ভূতলে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সচ্ছ শীতল হাওয়া বনহুরকে আলিঙ্গন জানালো। বনহুর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তাকাতেই দেখলো—ঠিক তাদের গুহার এই গোপন সুড়ঙ্গমুখের অতি নিকটেই বেয়ে চলেছে একটি জলপ্রপাত। ঠিক্ পাহাড়িয়া নদী বলা চলে। ভালভাবে লক্ষ্য করতে বনহুর দেখলো— সুড়ঙ্গমুখের সঙ্গে সিঁড়ির ধাপের মত কতকগুলো ধাপ চলে গেছে নীচের দিকে ঠিক্ জলপ্রপাতের নিকটে।

সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায়।

বনহুর আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে নীল আকাশটা দেখে নিলো। এ সুড়ঙ্গমুখ এবং জলপ্রপাতটা পর্বতের ঠিক অপর পাড়ে।

এবার বনহুর তাড়াতাড়ি নূরী এবং কেশবের নিকটে এসে বললো—গুহা থেকে বের হবার দ্বিতীয় পথ পেয়েছি।

নূরী আর কেশব কি করে রত্নগুলো ভালভাবে নিতে পারবে সেই চেষ্টা করছিলো। বনহুরের কথায় খুশিতে আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

বনহুর বললো—রেখে দাও ওসব, আগে চলো দেখা যাক্ জলপ্রপাত বেয়ে! যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না।

জলপ্রপাত বেয়ে! এ তুমি কি বলছো বনহুর ?

হাঁ চলো দেখবে।

বনহুর নূরী এবং কেশবসহ গুহার শেষভাগে সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়ালো। মুক্ত আলো-বাতাস তার চোখেমুখে লাগতেই এবং জলপ্রপাতে নজর পড়তেই উচ্ছল হয়ে উঠলো সে খুশিতে। সোনালী সূর্যের আলো রূপালী জলপ্রপাতে পড়ে অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো।

নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরে খুশিভরা কণ্ঠে বললো—হুর, কি সুন্দর—না?

বনহুর তখন গম্ভীর কণ্ঠে বললো—সুন্দরের মাধুর্য উপভোগ করার সময় এখন নয়। কি করে আমরা এখন এ গুহা থেকে জংলীদের নিষ্ঠুর দৃষ্টি এড়িয়ে চলে যেতে পারি, সেই চিন্তা করতে হবে।

বনহুরের কথায় নূরীর মুখ চিন্তাযুক্ত হলো।

কেশব বললো—ভয়ানক দুশ্চিন্তার কথা বাবু, কি করে এখান হতে যাওয়া যাবে?

উপায় একটা করতেই হবে কেশব। বনহুর সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে তাকাতে লাগলো দূরে চারিদিকে। সুড়ঙ্গমুখের উপরেই সুউচ্চ পর্বতমালার শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্গ, আর নীচে জলপ্রপাতের কাকচক্ষুর ন্যায় সচ্ছ জলরাশি পর্বতমালার গায়ে অসংখ্য গাছ-পাছড়া আর লতাগুল্ম আচ্ছাদিত।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—এসো কেশব, আমাদের জলপথেই পালাতে হবে।

জলপথে! অবাক কণ্ঠে বললো নূরী।

বললো বনহুর—হাঁ, জলপথে—জলপথে পালানো ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব বাবু? বললো কেশব।

সম্ভব করে নিতে হবে, বুঝলে? এসো তোমরা আমার সঙ্গে। বনহুর নূরী আর কেশবসহ সুড়ঙ্গমুখের বাইরে পা বাড়ালো। এদিকে ঘন জঙ্গল বা অন্ধকারময় নয়। পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। বনহুর ওদের নিয়ে পর্বতের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো।

পর্বতের গা অত্যন্ত খাড়া ছিলো, নূরী এবং কেশবের উঠতে খুবকষ্ট হচ্ছিলো। বনহুর নূরীর হাত ধরে তাকে সাহায্য করছিলো। নূরী এবং কেশব ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলো। ঠিকভাবে চলতে পারছিলো না তারা। বনহুরের ক্ষুধাও কম নয় তবে সে সহ্য করতে পারে। কতদিন সে প্রায় সপ্তাহ না খেয়ে কাটিয়েছে হয়তো সামান্য পানি বা ফলমূল খেয়ে তাকে মাসের পর মাস জীবন কাটাতে হয়েছে। কাজেই এসব তার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার।

বনহুর আর কেশব মিলে গাছ-গাছড়া কেটে এবং মোটা মোটা লতাপাতা দিয়ে কাঠের একটা ভেলা তৈরী করতে শুরু করে দিলো।

বনহুর এবং কেশবের কাছে সুতীক্ষ্ণ-ধার ছোরা ছিলো, কাজেই ভেলা তৈরীর ব্যাপারে তেমন বেগ পেতে হলো না।

কিন্তু এখন সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো খাবে কি ওরা।

নূরী নিজের চেয়ে বেশি চিন্তিত হলো তার বনহুরের জন্য। অত্যন্ত পরিশ্রমে বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডল রাঙা হয়ে উঠেছিলো। ললাট বেয়ে ঘাম ঝরছিলো দরদর করে। বার বার বনহুর হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে ফেলছিলো।

নূরী বললো—আর কত খাটবে? সত্যি তোমার কষ্ট আমার মনকে বিচলিত করছে হুর।

হাসলো বনহুর, কোনো জবাব দিলো না।

অবিরাম প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর মজবুত ভেলা তৈরী করে ফেললো বনহুর আর কেশব। গাছপালার ডাল এবং লতাপাতা দিয়েই তৈরী হলো ভেলাটা।

এবার বনহুর বললো—এখন খাবার অন্বেষণে চলো কেশব।

এই বন-জঙ্গল আর পর্বতে খাবার? অবাক হয়ে বললো কেশব।

হয়তো ভাগ্য প্রসন্ন হলে খাবার জুটেও যেতে পারে। বনহুর কেশবসহ অগ্রসর হলো।

নূরীও অনুসরণ করছিলো, বললো বনহুর—তোমার যেতে হবে না নূরী তুমি এখানে বসে থাকো।

নূরীর পা দুখানা অবশ হয়ে পড়েছিলো যেন। বড্ড ক্লান্তি বোধ করছিলো সে, বনহুরের কথায় সে বসে পড়লো ভেলাটার উপরে।

বনহুর আর কেশব চলে গেলো।

ক্ষুধায় কাতর শুধু বনহুর নয়—কেশব আর নূরীর জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলো সে। তাছাড়া ভেলায় চেপে জলস্রোতে ভাসবার পূর্বে কিছু খাবারের নিতান্ত প্রয়োজন।

বনহুর আর কেশব হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো দূরে—অনেক দূরে। এদিকে পর্বতের গায়ে জঙ্গল বেশ ফাঁকা ও স্বল্প। প্রায় বৃক্ষই ফলশূন্য, তবে মাঝে মাঝে দু'একটা ফলযুক্ত বৃক্ষ নজরে পড়তে লাগলো। কিন্তু সেসব ফল ভক্ষণ উপযোগী নয়।

বনহুর আর কেশব তবু এগিয়ে চলেছে।

বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো নূরী।

ক্ষুধা এবং ক্লান্তিতে অল্পসময়েই ঘুমিয়ে পড়লো সে। শুন্য ভেলার উপরে একটি ঝরা বনফুলের মতই লাগছিলো তাকে। তৈলবিহীন রুক্ষচুল, ঘাগ্ড়া আর ওড়না মলিন হয়ে পড়েছে। ছিঁড়েও গেছে কয়েক স্থানে। বিষন্ন ক্ষুধাকাতর মুখখানাকে অপূর্ব লাগছে। গহন জঙ্গলে দেবকন্যার মতই সুন্দর লাগছে নূরীকে।

এমন সময় একদল লোক এসে পড়ে সেখানে। কয়েকজনের হস্তে রাইফেল। পর্বতমালার বুক হতে জলপ্রপাতের ধারে হঠাৎ তাদের নজর চলে যায় নূরীর উপরে।

প্রত্যেকের চোখে মুখে জাগে রাজ্যের বিস্ময়।

এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নেয়। ভাবে ওরা এই সুউচ্চ পর্বতগাত্রে জঙ্গলে মানবকুমারী এলো কোথা হতে। পা পা করে দলটি এসে দাঁড়ালো নূরীর পাশে ভেলাখানার অদূরে। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে দেখছে ওরা—কি আশ্চর্য ব্যাপার।

এ দলটি এসেছে জলপথে। অনেক দূরদেশ থেকে তারা এখানে এসেছে কোনো এক ছবির সুটিং-এর জন্য। জাহাজে তাহাদের ক্যামেরা এবং সুটিং-এর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রয়েছে। আর আছে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য।

ছবির পরিচালক স্বয়ং আছেন এ দলে।

তাঁরা ভাল একটি জায়গার অন্বেষণ করে ফিরছেন। এমন সময় হঠাৎ নজর পড়লো ঘুমন্ত নূরীর উপর।

নূরীর অপূর্ব রূপচ্ছটা সবাইকে বিমুগ্ধ করলো।

স্বয়ং পরিচালকের চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। একটা ভবিষ্যৎ আশার স্বপ্ন দেখলেন তিনি মনের আকাশে। হস্তস্থিত অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট নিক্ষেপ করে ঝুঁকে পড়লেন তিনি নূরীর মুখের কাছে। ডাকলেন পরিচালক সাহেব—এই মেয়ে শুনছো? এ মেয়ে---

অত্যন্ত ক্লান্তি আর অবসাদে নূরীর নিদ্রা ঘনীভূত হয়ে পড়েছিলো। কানে মানুষের কণ্ঠস্বর পৌঁছতেই নিদ্রা ছুটে গেলো তার। চোখ মেলতেই দেখলো—তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন লোক। চমকে উঠে বসলো নূরী। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো সে সকলের মুখে।

পরিচালক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে এগিয়ে এলেন নূরীর পাশে, শান্ত গলায় বললেন—তুমি এখানে এলে কি করে?

নূরী কোনো জবাব দিলো না, মনের মধ্যে তার ঝড় উঠেছে—না জানি এরা কে বা কোথা হতে এসেছে। বনহুর আর কেশবই বা গেলো কোথায়—কত দূরে। নূরী ভীত দৃষ্টি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো, চকিত হরিণীর মত তাকাতে লাগলো এদিক-ওদিকে।

পরিচালক পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—এই বনে তুমি কোথা হতে এসেছো? কি নাম তোমার?

নূরী কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। পরিচালকের কথাবার্তা সে সব স্পষ্ট বুঝতে পারছে কিন্তু জবাব দিতে পারছে না। কি বলবে সে—কি বলতে কি বলে বিপদে পড়বে, তাই নীরব রইলো নূরী।

পরিচালক মনে করলেন, মেয়েটি বোবা বা সে তার কথাবার্তা বুঝতে পারছে না, হয়তো বা বাংলা ভাষা সে জানে না কিংবা বোঝে না।

অন্যান্য সবাই বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে দেখছে।

পরিচালক ইশারা করলেন মেয়েটিকে ধরে তাদের জাহাজে নিয়ে যেতে।

মালিকের আদেশ পেয়ে কয়েকজন কর্মচারী ধরে ফেললো নূরীকে টেনে-হিচড়ে নিয়ে চললো জাহাজের দিকে।

নূরী আঁচড় দিয়ে কামড়ে তবু উদ্ধার করতে পারলো না নিজকে। পরিচালকের অদেশে তাঁর সঙ্গিগণ নূরীকে জোর করে ধরে নিয়ে জাহাজে এনে তুললো।

এমন একটা মেয়েকে হঠাৎ বনে কুড়িয়ে পাওয়ায় খুশিতে আত্মহারা হলেন পরিচালক আসলাম আলী। তিনি আর এখানে বিলম্ব করা উচিৎ মনে করলেন না। নূরীকে একটা ক্যাবিনে বন্ধ করে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাহাজ ছাড়ার আদেশ দিলেন।

বন্ধ ক্যাবিনে ক্রুদ্ধ সিংহীর ন্যায় ছট্ ফট্ করতে লাগলো নূরী। মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো টেনে। মেঝেতে পা আছড়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে রোদন করতে লাগলো সে।

জাহাজ তখন চলতে শুরু করেছে।

পরিচালক এবং অন্যান্য সহকর্মী একটা ক্যাবিনে বসে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠলেন। এমন একটা অপ্সরীর মত যুবতীকে তারা লাভ করেছেন, যার জন্য আনন্দে উৎফুল্ল সবাই।

প্রধান সহকারী বশীর আহম্মদ বললেন—স্যার বরাৎ বলতে হবে। হঠাৎ এই গহন জঙ্গলে এমন রত্ন কুড়িয়ে পাবো আমরা—কল্পনাও করিনি।

হাঁ, সত্যিই বলেছেন আহম্মদ সাহেব।

ক্যামেরাম্যান জ্জোহা চৌধুরী বললেন—আমাদের আগামী ছবির নায়িকার জন্য মেয়েটি সুন্দর মানাবে।

অন্য একজন সহকারী বললো—মেয়েটিকে বাগে আনাই বড় মুস্কিল হবে বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ আহম্মদ বললেন—বনের পশুও পোষ মানে, আর এতো মানুষ। কৌশলে একে বশে আনতে হবে, বুঝলেন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আশ্চর্য, এমন স্থানে মেয়েটি এলো কি করে?

সহকারীদের একজন বললো—হয়তো জংলীদের মেয়ে।

ক্যামেরাম্যান জ্জোহা চৌধুরী বললেন—আমার মনে হয় কোনো ইরানী মেয়ে।

আর একজন বললো—ঠিক্ তাই হবে, ইরানীদের মেয়েরাই এতো বেশি সুন্দরী হয়।

অন্য আর একজন বললো —কাশ্মিরী মেয়ের মত কিন্তু চেহারা---

এক একজন এক একরকম মতামত প্রকাশ করতে লাগলো মেয়েটি সম্বন্ধে।

পরিচালক তখন গভীরভাবে ভেবে চলেছেন কার মেয়ে—কোথা হতে এলো এই পর্বতমালার উপরে। জনহীন নির্জন স্থানে কিভাবে এলো মেয়েটি—সব যেন বিস্ময়কর লাগছে তাঁর কাছে।

❑

সমস্ত জাহাজময় চলেছে যুবতীটিকে নিয়ে নানারকম আলাপ আলোচনা। এক একরকম মতামত চলতে লাগলো। এমন কি কুলি খালাসী এবং সারেঙ্গাদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

এখানে যখন নূরীকে ক্যাবিনে আবদ্ধ করে তাকে নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলছে তখন এক গাদা সুস্বাদু ফলমূল নিয়ে ফিরে আসে বনহুর আর কেশব। প্রচুর ফল সংগ্রহ করে এনেছে তারা নূরীর জন্য।

কিন্তু ভেলার পাশে এসে বনহুর আর কেশব নূরীকে না দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়লো। প্রথমে মনে করলো নূরী নিকটে কোথায় গেছে; তাই বনহুর চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। এখানে বন হলেও বেশ ফাঁকা এবং পরিস্কার। বহুদূরে নজর চলে যায়। কোনোরকম হিংস্র জীবজন্তু এ জঙ্গলে নেই, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বনহুর আর কেশব নূরীকে একা রেখে যেতে কোনোরকম দ্বিধা বোধ করেনি।

নূরীও অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করায় ওদের সঙ্গে যায়নি বা যেতে রাজী হয়নি।

বনহুর অবশ্য কেশবকে নূরীর নিকটে থাকবার জন্য বলেছিলো কিন্তু নূরীই তাকে থাকতে দেয়নি তখন। বনহুর একা যাবে—কোনো অসুবিধায় পড়বে, সেই কারণে নূরী চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। এমন পরিস্কার স্বচ্ছ সুন্দর জায়গায় তার কোনো বিপদ ঘটবে বা ঘটতে পারে, কল্পনাও করতে পারেনি সে।

বনহুর আর কেশব নূরীকে না দেখতে পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, চীৎকার করে ডাকতে লাগলো—নূরী নূরী নূরী---

কিন্তু কোথায় নূরী!

কেশব ছুটাছুটি শুরু করে—একবার এদিকে যায়—একবার ওদিকে। মুখ তার অন্ধকার বিষাদময় হয়ে উঠেছে মুহূর্তে।

নূরীকে কেশব নিজ বোনের মতই স্নেহ করে—ভালবাসে। একদিন অবশ্য নূরীকে সঙ্গিনীরূপে পাবার জন্য সে উন্মুখ ছিলো, আজ তার ভালবাসা পবিত্রতার বন্ধনে গভীর হয়ে উঠেছে। নূরীর অদর্শনে কেশব পাগলের মত

বনের মধ্যে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো আর উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলো—ফুল, ফুল, কোথায় তুমি গেলে ফুল---

বনহুর নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোঁচড় হতে ফলগুলো গড়িয়ে পড়লো ভূতলে।

কেশব বনের মধ্যে ডেকে ডেকে এক সময় ফিরে এলো বনহুরের সম্মুখে, ব্যাকুল কণ্ঠে বললো—এখন কি হবে বাবু?

বনহুর কোনো জবাব দিলো না বা দিতে পারলো না। আর কিইবা দেবে! হৃদয়ে আগুন জ্বলছে—এতবড় ভুল সে করলো কি করে! এই যে পর্বতমালা রয়েছে, এই যে গাছাপালা রয়েছে—বনহুর বা কেশবের এখনও কোনো হিংস্র জীবজন্তু নজরে পড়েনি। গেলো কোথায় নূরী! হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো ভেলার পাশে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে চক্ষু তার স্থির হয়ে গেলো, উবু হয়ে হাতে তুলে নিলো একখন্ড অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর, অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা চোখের সম্মুখে ধরে বললো—কেশব এখানে কোনো সভ্য সমাজের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিলো।

কেশবও অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে সিগারেটের টুকরাটা, বললো সে—বাবু তাহলে ফুলকে কি কোনো মানুষ ধরে নিয়ে গেছে?

হাঁ নূরীকে কোনো সভ্য সমাজের মানুষ ধরে নিয়ে গেছে। জংলী বা অসভ্য জাতীরা এমন সিগারেট পাবে কোথায় বলো? কিন্তু কারা তারা এবং নূরীকে নিয়ে গেলই বা কোথায়?

বাবু নিশ্চয়ই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

না কেশব, জঙ্গলে তারা যাবে না, নিশ্চয়ই নীচের দিকে—মানে পর্বতের পাদমূলে নেমে গেছে।

বনভূমি এবং পর্বতের পাদমূলে বনহুর আর কেশব নূরীর অন্বেষণ করে ফিরলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরলো তারা দু'জন সমস্ত দিন ধরে। একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো পর্বতমালার গায়ে।

বনহুর হতাশ হয়ে বসে পড়লো ভূতলে। সন্ধ্যার অন্ধকার শুধু বিশ্বটাকেই অন্ধকারময় করে দেয়নি তার অন্তরের সমস্ত আলোও যেন নিভে গেলো বেলাশেষের অস্তমিত আলোকরশ্মির সঙ্গে সঙ্গে।

কেশবের অবস্থা আরও শোচনীয়। একে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর সে তদুপরি নূরীর অন্তর্ধান নিয়ে সমস্ত দিন ধরে প্রায় সমস্ত পর্বতমালা এবং পর্বতের পাদমূল চষে ফিরেছে—তবু যদি ফিরে পেতো তাকে। অত্যন্ত ভেংগে পড়লো কেশব। বনহুর মুষড়ে পড়লেও সে কঠিন পুরুষ—সহ্য করা তার অভ্যাস হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ হতবাক বিষাদমগ্ন হয়ে থেকে

বললো বনহুর—কেশব, নূরী এ পর্বতমালা বা এ জঙ্গলে নেই। তাকে নিয়ে হরণকারী দল চলে গেছে দূরে কোথাও।

তাহলে কি হবে বাবু? কেঁদে উঠে বললো কেশব।

কি বলবো কেশব, আমি যে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম। এমন যে হবে আমি ভাবতেও পারিনি।

সত্যি বাবু, কোথা থেকে কেমন করে কারা এলো যারা ফুলকে চুরি করে নিয়ে গেলো। আহা ফুল না জানি কত চীৎকার করেছে কত ডেকেছে আমাদের দু'জনাকে---

কেশবের ক্রন্দনভরা আকুল কণ্ঠে বনহুরের মন আরও গুমড়ে কেঁদে উঠে বলে বনহুর—কেশব, আজ রাত আমাদের এ বনেই কাটাতে হবে।

তারপর কি করবেন বাবু?

চলে যাবো এ বন ছেড়ে।

কিন্তু ফুল! ফুলের সন্ধান না নিয়ে আপনি কেমন করে এ বন ত্যাগ করবেন বাবু?

গভীর চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললো বনহুর—ফুল আর এ জঙ্গলে নেই কেশব! তাকে নিয়ে হরণকারীদল এ জঙ্গল, এ পর্বতমালা ত্যাগ করে চলে গেছে।

বনহুর আর কেশব রাতটা কাটিয়ে দেবার মানসে একটা বৃক্ষে আহরণ করলো, চওড়া ডাল দেখে বসলো দু'জনা। নীচে হঠাৎ কোনো জীবজন্তুর আবির্ভাব ঘটতে পারে, সেজন্যই গাছের ডালে উঠে বসেছিলো ওরা।

গাছের ডালে উঠে বসার একটু পর হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো—জাহাজের শব্দ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিন্তু বহু দূর-দূরান্ত হতে এ শব্দ আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পর্বতমালার ঠিক সম্মুখ বা পিছন—কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে তাও বোঝা যাচ্ছে না।

কেশব বললো—এটা কিসের শব্দ বাবু?

বনহুর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শব্দটা শোনার পর বললো—কোনো জাহাজ আমাদের পর্বতের আশপাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কিংবা কোনো স্টীমারের শব্দ---

বাবু, এই জাহাজেই ফুলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, না হলে এদিকে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।

এ কথার কোনো জবাব দিলো না বনহুর।

গভীর রাতে একটু তন্দ্রার মত হয়ে পড়েছিলো বনহুর আর কেশব। হঠাৎ একটা হই-হুল্লোড়ের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেলো। দেখলো ওরা দু'জনা—দূরে—অনেক দূরে পর্বতের পাদমূলে ঠিক যেখানে রত্নগুহার মুখ এবং যেখান দিয়ে জলপ্রা পাত বেয়ে চলেছে সেখানে অসংখ্য মশালের আলো দপ

দপ করে জ্বলছে। যদিও আলোকরশ্মি খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না এবং হই-হুল্লোড়ও অত্যন্ত অস্পষ্ট তবু বোঝা যাচ্ছে— সেখানে খুব হট্টগোল চলেছে।

কেশব আর বনহুর বৃক্ষশাখায় বসে দেখতে লাগলো।

অল্পক্ষণ লক্ষ্য করতেই বনহুর বুঝতে পারলো— জংলিগণ ছাড়া ওরা অন্য লোক নয়। বনহুর বললো—কেশব চলো ওখানে যেতে হবে।

ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো কেশব—বাবু ওখানে যাওয়া ঠিক্ হবে না ওরা জঙ্গলী দল--

সে আমি বুঝতেই পারছি কেশব, জংলী দল তাদের রত্নগুহায় মানুষ প্রবেশের গন্ধ পেয়েছে।

তাই বুঝি---

হাঁ, ওরা উন্মাদ হয়ে উঠেছে এখন।

সেখানে যাওয়াটা কি তাহলে উচিত হবে বাবু?

না গিয়ে যে উপায় নেই কেশব। দেখতে চাই নূরী, ওদের কবলে পড়ে যায়নি তো?

তাই তো বাবু, চলুন চলুন বাবু আর দেরী করবো না। কেশব গাছ থেকে নামতে শুরু করলো, নূরীর কথা মনে হতেই ভয়-ভীতি ভুলে গেলো সে।

বনহুর আর কেশব দ্রুত চলতে লাগলো, একরকম প্রায় ছুটেই চললো ওরা। রাতের অন্ধকার হলেও বনটা ফাঁকা কাজেই চলতে অসুবিধা হচ্ছিলো না। তবে পর্বতের গা বেয়ে নীচে নামতে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছিলো তাদের।

অত্যন্ত দ্রুত চলার জন্য কিছু সময়ের মধ্যেই তারা দু'জন অনেক নীচে নেমে এলো। এখান হতে পর্বতের পাদমূল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মশালের উজ্জ্বল আলোতে দেখলো বনহুর আর কেশব—অসংখ্য জংলী সুড়ঙ্গমুখের বাইরে ছুটাছুটি আর হই-হুল্লোড় করছে। বনহুর বুঝতে পারলো জংলী দল তাদের রত্ন-গুহায় মানুষের প্রবেশ জানতে পেরেছে এবং গুহার পিছন দরজা মুক্ত দেখে ভীষণ ক্ষেপে গেছে।

এক এক জংলীকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় ঠিক হিংস্র জন্তুর মতই লাগছিলো। সেকি জমকালো তাদের চেহারা! সমস্ত শরীরে সাদা সাদা রেখা টানা ঠোঁট এবং দাঁতগুলোও সাদা ধবধবে। চোখগুলো দেহের আকারে ক্ষুদ্র ;মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া আর খাটো। প্রত্যেকের হস্তে সুতীক্ষ্ণ-ধার বর্শা আর বল্লাম।

বনহুর আর কেশব একটা গাছের আড়ালে বেশ কিছু উঁচুতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। জংলিগণ কি যেন একরকম শব্দ করছে আর ছুটোছুটি হুটোহুটি করছে।

মশালের আলোতে সুড়ঙ্গমুখ এবং আশপাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বনহুর ও কেশব। নূরীর সন্ধানে বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলো, কিন্তু নূরী বা কোনো সভ্য মানুষের চিহ্ন দেখতে পেলো না। ভাবলো বনহুর নূরীকে নিশ্চয়ই ওরা হত্যা করেছে বা গুহার ভিতর বন্দী করে রেখেছে। বুকটা ধক্ ধক্ করে উঠলো কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো— নূরী জংলীহস্তে বন্দী হয়নি। তাকে সভ্য সমাজের কোনো দুষ্ট দল ধরে নিয়ে গেছে—সে নিজ চোখে দেখেছে দামী সিগারেটের টুকরো---

হঠাৎ বনহুরের চিন্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সে দেখলো —সুড়ঙ্গ মুখে এসে দাঁড়িয়ে আছে জংলী রাণী—তার প্রেমানুরাগিনী বিচিত্রময়ী নারী। চোখেমুখে তার কঠিন ভাব, দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। অদ্ভুত শব্দে কি যেন উচ্চারণ করলো জংলী রাণী।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জংলী নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়ালো।

জংলী রাণী সুউচ্চ কণ্ঠে পুনরায় কিছু উচ্চারণ করলো। অমনি বনহুর লক্ষ্য করলো—কয়েকজন জংলী গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো।

স্তব্ধ হয়ে দেখছে বনহুর আর কেশব।

কেশব বললো ফিস ফিস করে—না জানি কি দেখতে হবে বাবু। আমার মাথা ঘুরছে আমি আর দাঁড়াতে পারছি না---

তুমি বসে পড়ো কেশব তোমাকে দেখতে হবে না।

বনহুর তাকে বসতে বললেও সে বসতে পারলো না। বনহুরের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

বিস্ময়ভরা নজরে দেখলো বনহুর আর কেশব এক অদ্ভুত কান্ড! যেসব জংলী গুহামধ্যে প্রবেশ করেছিলো তারা কয়েকজন মিলে রত্নসিন্দুক ধরে বের করে নিয়ে এলো, সুড়ঙ্গমুখে সারিবদ্ধ করে রাখলো।

বনহুর আর কেশব অন্ধকারেও একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। দেখলো বনহুর আর কেশব—জংলী রাণী হাত উঁচু করে কি যেন শব্দ করলো অমনি বলিষ্ঠ জংলিগণ এক একটা রত্নসিন্দুক তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলো গভীর জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে।

কেশব অস্ফুট আর্তকণ্ঠে বললো—বাবু, সর্বনাশ—ওরা রত্নসিন্দুকগুলো গভীর জলপ্রপাতের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। হায় কি হলো বাবু?

কেশব স্থির হও। ওরা বুদ্ধিমানের কাজই করছে। কারণ রত্নগুহার সন্ধান মানুষ যখন জানতে পেরেছে তখন তারা এ গুহা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নয়, তাই নিশ্চিন্ত স্থানে ওরা রত্নসিন্দুকগুলো লুকিয়ে রাখলো।

গভীর জলমধ্যে নিক্ষেপ করে ওরা---

হাঁ, ওরা নিশ্চিন্ত হলো।

বাবু!

কেশব, আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। কারণ রত্নসিন্দুকগুলো এখন ঠিক্ জায়গায় রক্ষিত রইলো।

বাবু! কেশবের চোখেমুখে বিস্ময়, অন্ধকারে কেশবের মুখ বনহুর দেখতে না পেলেও তার কণ্ঠস্বরে মনোভাব বুঝে নিলো।

বললো বনহুর—কেশব, জংলিগণ তাদের রত্নসিন্দুক যেখানেই লুকিয়ে রাখুক, দস্যু বনহুরের কবল থেকে নিশ্চিন্ত রাখতে সক্ষম হবে না। জংলীরা সিন্দুকগুলো জলমধ্যে নিক্ষেপ না করলেও আমিই ওগুলো জলমধ্যে গোপন রেখে তবেই যেতাম। যাক্ আমার কাজগুলোই ওরা সমাধা করলো।

কেশব স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোনো কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো না।

বনহুর অন্ধকারেই একটু হাসলো, তারপর বললো—কেশব তুমি কি মনে করো ওগুলো আমাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো?

বাবু, তাহলে কি ওগুলো নিতেন না?

না কেশব, এখন ওসব নেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। কারণ আমরা এখন কোন্ পথে কেমনভাবে কোথায় গিয়ে পৌঁছবো কে জানে। জীবন রক্ষাই সঙ্কটাপন্ন হয়ে দাঁড়াবে।

রত্নসিন্দুক সামলাবে কখন? ঐ দেখো জংলিগণ এবার নিশ্চিন্ত মনে ফিরে যাচ্ছে। আর কোনা চিন্তা নেই ওদের। হঠাৎ হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে বনহুর তারপর হাসি থামিয়ে বলে—নির্বোধ জংলী দল---

জংলিগণ সব অন্তর্হিত হলো সুড়ঙ্গমুখে গুহার ভিতরে। মশালের আলো এবং তাদের কলকণ্ঠের চীৎকারধ্বনি আর কর্ণ গোচর হচ্ছে না।

ওদিকে পূর্বাকাশ আলোকিত করে ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে তখন।

বনহুর আর কেশব বৃক্ষতলে বসে পড়লো।

কেশব বললো—ফুলের সন্ধান না নিয়ে আমি কিছুতেই এ পর্বত ত্যাগ করবো না বাবু।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর—সে এ পর্বতের কোথাও নেই কেশব।

কেমন করে জানলেন বাবু?

ঐ সিগারেটের টুকরো এবং রাত্রিতে জাহাজ বা ষ্টীমারের শব্দ আমাকে নিঃসন্দেহ করেছে কেশব।

তাহলে ফুলকে নিয়ে হরণকারীদল পালিয়ে গেছে?

সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত আমি।

এখন কি করবেন বাবু?

চলো বেলা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা জলপ্রপাতে আমাদের ভেলা ভাসিয়ে দেই। যেমন করে হোক সন্ধান করতেই হবে নূরীর।

তাকে আমরা আর পাবো বাবু?
কেমন করে বলবো কেশব। কেমন করে বলবো বলো?

❑

বনহুর আর কেশব অনেক কষ্টে তাদের তৈরী ভেলাখানা নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। জলপ্রপাতে ভেলা ভাসিয়ে চেপে বসলো বনহুর আর কেশব।

কেশবের গন্ড বেয়ে ঝরতে লাগলো অশ্রুধারা।

বনহুরের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত না হলেও মন তার জমাট বেদনায় গুমড়ে কেঁদে কেঁদে উঠছিলো। অতিকষ্টে নিজকে সংযত রেখেছিলো সে। কেশব কেঁদে -কেটে আকুল হয়ে পড়েছে—সেও যদি কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ করে তাহলেও আরও ভেংগে পড়বে।

জলপ্রপাতে ভেলা ভাসিয়ে বনহুর আর কেশব উঠে বসলো, ভোরের সূর্য তখন তীব্র হয়ে উঠেছে।

ভেলাখানা তীরবেগে ভেসে চললো উঁচু থেকে নীচের দিকে। ক্রমান্বয়ে সুড়ঙ্গমুখ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। পর্বতমালার ভিতর দিয়ে খরস্রোতা জলপ্রপাত বেয়ে ভেলাখানা এগুচ্ছে।

বনহুর গম্ভীর স্থির কণ্ঠে বললো—কেশব, পথ চিনে রাখো, আবার আমাদের এই পথে একদিন আসতে হবে।

অবাক হয়ে কেশব তাকালো বনহুরের মুখের দিকে বললো—সেকি বাবু?

হাঁ কেশব, আগে নূরীকে খুঁজে বের করবো। তারপর ফিরে যাবো আমার আস্তানায়। আমার দলবল নিয়ে আবার আসবো। না হলে সাপুড়ে সর্দারের শেষ বাসনা সিদ্ধ হবে না।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একটা বর্শা এসে বিদ্ধ হয় বনহুরের ঠিক্ পাশে ভেলার গায়ে।

চমকে এক সঙ্গে ফিরে তাকায় বনহুর আর কেশব। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যায়, দেখতে পায়—তীরে একটা জমকালো বিরাট অশ্বপৃষ্ঠে বসে আছে জংলী রাণী স্বয়ং। বাতাসে তার কটা চুলগুলো উড়ছে। দক্ষিণ হস্তে তার আর একখানা উদ্যত বর্শা।

পরবর্তী বই

নাবিক দস্যু বনহুর

নাবিক দস্যু বনহুর —৩০

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ভাগ্যিস বর্শাখানা বনহুরের দেহে বিদ্ধ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে জংলীরাণীর নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় বর্শাও তীরবেগে ছুটে এলো। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর কাৎ হলো একপাশে।

বর্শাখানা এসে ঠিক বনহুরের সম্মুখে ভেলায় গেঁথে গেলো। সামান্যের জন্য তার দেহে বিদ্ধ হয়নি বা হলো না।

ভীত স্বরে কেশব বললো—সর্বনাশ! বাবু, জংলীরাণী অশ্ব নিয়ে ছুটে চলছে আমাদের ভেলার সঙ্গে।

বনহুর সোজা হয়ে বললো—অশ্বের গতির চেয়ে আমাদের ভেলার গতি আরও দ্রুত আছে।

বনহুরের কথা মিথ্যা নয়, তাদের ভেলা অত্যন্ত দ্রুত ভেসে চলেছে। কারণ জলপ্রপাতের গতি এখানে খুব বেশি।

ওদিকে পাড়ের উপর দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে এগুচ্ছে জংলীরাণী। হস্তে তার আর একখানা উদ্যত বর্শা। বনহুর তাকিয়ে দেখলো অশ্বপৃষ্ঠে আরও কতকগুলো বর্শা বাঁধা রয়েছে, জংলীরাণী তারই একটি করে বর্শা খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করছে তাদের লক্ষ্য করে।

ভেলাখানা অত্যন্ত বেগে স্রোতের টানে সম্মুখ দিকে ভেসে চলেছে। প্রশস্ত নদীরক্ষে কোনো বাধা পাচ্ছিলো না বা কোনো অসুবিধা হচ্ছিলো না ভেলাখানার।

বনহুর আর কেশব ভেলাখানা শক্ত করে ধরে বসে রইলো কিন্তু তাদের দৃষ্টি রয়েছে তীরস্থ অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে চলা জংলীরাণীর দিকে। রুদ্রাণী মূর্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে জংলীরাণী।

কেশবের মুখ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

বনহুরের মুখমন্ডলে একটা কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে। জংলীরাণীকে কাবু করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে না, কারণ জংলীরাণীর অসংখ্য জংলী অনুচরগণ এখন তার সঙ্গে নেই। কিন্তু যেভাবে তাদের ভেলা চলেছে তাতে জংলীরাণীর কবলে ধরা পড়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ভেলা বহুদূরে চলে গেলো।

ওদিকে জংলীরাণী অশ্বপৃষ্ঠে তীরবেগে ছুটে আসছে।

পর্বতের পাদমূল বেয়ে জলপ্রপাতটি—কাজেই দু' পাশের তট শুধু কঠিন পাথরে তৈরী এবং অত্যন্ত উঁচুনীচু। জংলীরাণী অশ্বপৃষ্ঠে ভেলাখানাকে অনুসরণ করলেও ঠিকমত এগুতে সক্ষম হচ্ছিলো না। তবু ক্ষান্ত হবার কোনো লক্ষণ নেই জংলীরাণীর মধ্যে।

জমকালো বিরাটদেহী অশ্ব কতকটা বনহুরের তাজের মত দেখতে। এতো বিপদেও জংলীরাণীর অশ্বটিকে লক্ষ্য করে বনহুরের মনে তার তাজের কথা স্মরণ হতে লাগলো। কতদিন সে তাজকে দেখে না, তাজের পিঠে চাপেনি। না জানি আর সে কোনোদিন তাজের পিঠে চাপতে পারবে কিনা কে জানে।

বনহুর জংলীরাণীর অশ্বচালনা দেখে শুধু বিস্মিতই হলো না, মুগ্ধও হলো। বিনা লাগামে জংলীরাণী অশ্ব চালনা করছিলো। শুধুমাত্র লাগামের মত করে একখানা রশি ছিলো তার হাতের মুঠায়!

সূর্যের আলোকে জংলীরাণীর কণ্ঠের মূল্যবান হীরকখন্ডগুলো থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি ঠিকরে বের হচ্ছিলো। বহুদূর হতে বনহুর আর কেশবের চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিলো।

আকাশ সচ্ছ নীল।

সূর্য এখনও ঠিক মধ্য আকাশে উঠে আসেনি। পর্বতমালার সেই সুড়ঙ্গমুখ ছেড়ে এখন তাদের ভেলা বহুদূর চলে এসেছে। জংলীরাণী অশ্ব নিয়ে ছুটে আসছে, তীরস্থ পাথরখন্ডের উপর দিয়ে কৌশলে অশ্ব চালনা করছে সে।

হঠাৎ বনহুর লক্ষ্য করলো তাদের ভেলার গতি ক্রমেই হ্রাস হয়ে আসছে। বিপদ আসন্ন উপলব্ধি করলো বনহুর এবং কেশব। কারণ জংলীরাণী ক্রোধান্ধ সিংহীর ন্যায় উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে। কোনোক্রমে নাগালের মধ্যে পেলে মুহূর্ত বিলম্ব করবে না সে। সুতীক্ষ্ণ বর্শা প্রবেশ করিয়ে দেবে তাদের বক্ষমধ্যে।

ঐ দিন জংলীবাণী বনহুরের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়েই তাকে হত্যা করেনি। তাকে সে সাথী করে নেবে ভেবেছিলো। তাই জংলীরাণী তার সমস্ত প্রেম-ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছিলো ওকে। কিন্তু তার প্রতিদানে জংলীরাণী ওর কাছে পেয়েছে নিদারুণ প্রতারণা। বনহুর হত্যা করেছে জংলীরাণীর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরকে এবং পালিয়ে গেছে গোপনে।

জংলীরাণী সভ্য সমাজের কোমলহৃদয় নারী না হলেও তার মধ্যেও আছে একটি নারী প্রাণ। যে প্রাণে আছে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আর মাতৃত্বের সংযোজন।

প্রেমানুরাগীর নিকটে ব্যর্থতা লাভ করে তাই জংলীরাণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসার বহ্নিশিখা দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে তার মনের মধ্যে। প্রতিশোধ সে নেবেই ওকে হত্যা করে। হত্যাই উদ্দেশ্য নয় জংলীরাণীর, ওকে হত্যা করে রক্ত পান করবে সে, নিবৃত্ত করবে সে এর জ্বালাময়ী পিপাসা।

বিষম বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে বনহুর আর কেশব। কারণ তাদের ভেলার গতি ক্রমান্বয়ে মন্থর হয়ে আসছে। কেশবের মুখমন্ডল বিবর্ণ পাংশু হয়ে উঠেছে। বনহুরের মনেও যে একটা বিভীষিকার ছায়াপাত হয়নি তা নয়।

বনহুর কেশবকে লক্ষ্য করে আরো বেশি উদ্বিগ্ন হলো, বললো বনহুর—কেশব, ভেলার গতি কমে আসছে।

হাঁ বাবু, আর বুঝি জীবন বাঁচাতে পারলাম না।

এতো সহজে হতাশ হচ্ছো কেন কেশব। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কেশব, ভাল সাঁতার জানো?

বাবু, ঐ কাজ আমি জানি না।

সর্বনাশ করেছো তাহলে। আমি সেই ভরসাতেই আছি—এখন উপায়!

এমন সময় একটা শব্দ কানে আসে। পাশের তীর অভিমুখে তাকাতেই বনহুর দেখতে পায়....বিরাট একটা ফাটলের মধ্য হতে হু হু শব্দে জলস্রোত গড়িয়ে আসছে। দুই পাড় তার অত্যন্ত উঁচু।

মুহূর্তে বনহুর ফিরে তাকায় অদূরস্থ অশ্বপৃষ্ঠে জংলীরাণীর দিকে। তীরবেগে অশ্ব নিয়ে ছুটে আসছে সে, দক্ষিণ হস্তে তার সুতীক্ষ্ণ বর্শা।

বনহুর তাকালো তটস্থ সুউচ্চ ফাটলের দিকে। আর কয়েক রশি—তাহলেই জংলীরাণীর অশ্বের পথ রোধ হয়ে যাবে। বনহুর বললো—কেশব আমাদের ভয় কেটে গেছে।

বাবু!

হাঁ কেশব, ঐ দেখো সম্মুখে যে বিরাট ফাটল দেখছো, ঐ ফাটল পেরিয়ে কিছুতেই সে এ পাড়ে আসতে সক্ষম হবে না।

কেশবও তাকালো, সত্যিই ফাটলটা মস্তবড়—প্রায় বিশ গজের বেশিই হবে। নীচে কঠিন পাথর আর জলরাশি। জলরাশি কলকল করে ছুটে বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে নদীবক্ষে।

বনহুর আর কেশব ভেলার বুকে বসে দেখলো—জংলীরাণী অশ্ব নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিরাট ফাটলার ধারে। অশ্বটা সম্মুখস্থ পা দুটি উঁচু করে চিহি চিহি শব্দ করছে।

বনহুর আর কেশবকে নিয়ে ভেলাটা তখন মন্থর গতিতে এগুচ্ছে। স্তব্ধ নিশ্বাসে বনহুর তাকিয়ে আছে, এইবার জংলীরাণী কি করে দেখতে চায় সে।

হঠাৎ জংলীরাণী অশ্ব নিয়ে পিছু দিকে হটে যায়।

কেশব বলে উঠে—বাবু, বাবু, জংলীরাণী ফিরে যাচ্ছে......

কিন্তু কথা শেষ হয় না কেশবের, বনহুর আর কেশব বিস্ময়-ভরা নজরে দেখে—উল্কাবেগে জংলীরাণী অশ্ব চালিয়ে ফাটলটার দিকে ছুটে আসছে। জংলীরাণীর অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি পাথরখন্ডে যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে।

মাত্র কয়েক মিনিট—জংলীরাণীর অশ্ব ফাটল পার হবার জন্য লম্ফ দিলো ভীষণ আকারে কিন্তু এপারে এসে পৌঁছতে পারলো না, আছাড় খেয়ে পড়লো গভীর খাদের মধ্যে।

বনহুর দক্ষিণ হস্তে নিজের চোখ দুটি ঢেকে ফেললো।

কেশব আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো—ঠিক হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষা পেয়েছে......

হঠাৎ বনহুরের মুখ নজর পড়তেই থ' খেয়ে গেলো কেশব। একটা গভীর বেদনার ছাপ বনহুরের মুখমন্ডলে ঘনীভূত হয়ে ফুটে উঠেছে। ছলছল করছে তার দীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর—জংলীরাণীর বাসনা বিদ্ধ হলো না।

বাবু, জংলীরাণী মারা পড়েছে?

হাঁ কেশব, জংলীরাণীর দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। আর সে পৃথিবীর আলো দেখতে পাবে না, আর সে প্রতিশোধ নিতে পারবে না আমাদের উপর।

❑

অবিরাম ক'দিন ধরে ভেলাখানা ভেসে চলেছে। এদিকে জল স্রোত অত্যন্ত বেশি নয়, তবে একেবারে কমও নয়। ভেলার উপর বসে বসে অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছে বনহুর আর কেশব। ক্ষুধা-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে ওরা। বিশেষ করে কেশব ভেলায় শুয়ে পড়েছে, আর উঠবার শক্তিও নেই তার। বনহুরও অবশ্য অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে—শুধু ক্ষুধাই নয়, নূরীর জন্য তার মনে দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। কোথায় কোন দিকে নূরীকে নিয়ে গেছে তারা কে জানে। কেমন অবস্থায় আছে তাদের কাছে। কি আচরণ করছে তারা তার সঙ্গে তাই বা কে জানে!

বিশেষ করে কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে বনহুরের বড় মায়া হচ্ছিলো। বেচারী কেশবকে কি করে বাঁচাবে সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো। এই নিঃসঙ্গ মুহূর্তে একমাত্র কেশবই যেন তাহার সহায়-সম্পদ। ওকে হারালে বনহুর আরও মুষড়ে পড়বে, ভাল লাগবে না কিছু।

জলপ্রপাতের স্বচ্ছ জল পান করে আরও দুটোদিন কেটে গেলো। ভেলাখানা এবার আপন ইচ্ছায় ছুটতে শুরু করেছে, অত্যন্ত দ্রুত এগুচ্ছে ভেলাটা।

বনহুর ভাবলো, হয় এবার জীবন রক্ষা হবে নয় মৃত্যু হবে। সমস্ত দিন ভেলাখানা একভাবে চলার পর বিকেলের দিকে একটা শব্দ তার কানে আসতে লাগলো, ঠিক জলোচ্ছ্বাসের শব্দ বলে মনে হলো বনহুরের।

অনুমান মিথ্যা নয়—সন্ধ্যার পূর্বেই তাদের ভেলাখানা একটা বড় নদীতে এসে পড়লো। নদী হলেও অত্যন্ত খরস্রোতা এবং তরঙ্গায়িত প্রশস্ত নদী। এতোক্ষণ বনহুর এই নদীর তীব্রগর্জণ শুনতে পাচ্ছিলো। বনহুর চিন্তাগ্রস্ত হলো, বিশেষ করে কেশব অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষীণ হয়ে পড়েছিলো। বড় নদীতে ভেলাখানা একখন্ড কাষ্ঠ টুকরার মত ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে এগুচ্ছিলো।

কেশব বললো একবার—আর যে পারছি নে বাবু?

বনহুর কেশবের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—এখন আমাদের ভেলা বড় নদীতে এসে পড়েছে। আর কিছু সময় ধৈর্য ধরো কেশব, হয়তো কোনো ষ্টিমার বা জাহাজের নজরে পড়ে যেতে পারি।

কেশব শুকনো ঠোঁট দু'খানা জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো। সূর্যের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেছে, কালো হয়ে উঠেছে কেশবের মুখ। বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডল নিস্প্রভ মলিন, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলগুলো এলোমেলো। মর্মান্তিক অবস্থা বনহুর আর কেশবের।

বনহুর আর কেশব যখন মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ধুম্ররাশি নজরে পড়লো বনহুরের, দূরে—অনেক দূর ক্ষীণ রেখার মত। কিছুক্ষণ পরেই কানে একটা শব্দ এলো, ঠিক জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ বলেই মনে হলো তার।

আশায়-আনন্দে বনহুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কেশবকে ডেকে বললো বনহুর—ভাই কেশব, কোনো জাহাজ এদিকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। হয়তো আমরা এবার বাঁচতে পারি।

বনহুরের কথা সত্য নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্পষ্ট দেখতে পায় একটি জাহাজ দ্রুত এগিয়ে আসছে এই পথে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর নিজের দেহ থেকে জামাটা খুলে নিয়ে নাড়তে লাগলো।

জাহাজখানার গতি ক্রমান্বয়ে মন্থর হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। তাহলে দেখতে পেয়েছে ওরা তাদের ভেলাখানাকে।

কিছু সময় জাহাজখানা তাদের ভেলার অতি নিকটে এসে পড়লো। বনহুর লক্ষ্য করলো, জাহাজ থেকে বোট নামানো হচ্ছে।

এবার বনহুর কেশবকে তুলে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করে বললো— আমাদের উদ্ধারের জন্য বোট আসছে। কেশব, তুমি নিজকে একটু শক্ত করে নাও।

কেশব ধুক্‌ছিলো, অতিকষ্টে উঠে বসলো ভেলার বুকে। বনহুর ওকে ধরে রইলো মজবুত করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বোটখানা নিয়ে দুটি লোক এগিয়ে এলো বনহুর আর কেশবের ভেলার নিকটে।

বনহুর দেখলো এরা সম্পূর্ণ বাংগালী। ভেলার নিকটে পৌঁছে শুদ্ধ বাংলায় বললো—তোমরা কে? তোমাদের এমন অবস্থা কেন?

নিজের পরিচয় দেওয়া বনহুরের পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব হয়না—বিশেষ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। আজও বনহুর মিথ্যা বলতে বাধ্য হলো, বললো—জাহাজডুবি হয়ে আজ আমাদের এ অবস্থা।

লোক দুটির চোখেমুখে সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠলো, তুলে নিলো ওরা বনহুর আর কেশবকে তাদের বোটে।

জাহাজে পৌঁছে বনহুর বুঝতে পারলো, এরা বাংলাদেশের লোক। কথাবার্তায় আরও জানতে পারলো সে—এ জাহাজটির আরোহিগণ পর্যটক। দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোই এদের কাজ। নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন জায়গা, এবং অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করাই হলো এ জাহাজের সকলের উদ্দেশ্য।

জাহাজের ক্যাপ্টেন খাস বাংগালী, বয়স ষাটের অধিক হবে। সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। বড় অমায়িক ভদ্রলোক, নাম আর সাঈদ চৌধুরী। প্রচুর অর্থের মালিক আবু সাঈদ, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের মধ্যে এতো-বড় ধনবান অর্থশালী বিত্তলোক কমই আছে। বয়স ষাট হলেও দেহ এবং মন সজীব এবং বলিষ্ঠ। আবু সাঈদের ছোটবেলা হতেই নেশা—বিশেষ বিশেষ জিনিস আবিষ্কার করা। নতুনত্বের নেশায় তিনি সর্বক্ষণ ব্যস্ত। সংসারে তার একমাত্র কন্যা নীহার ছাড়া আর তেমন কোনো আকর্ষণ নেই। প্রচুর কর্মচারী দ্বারা কোম্পানী পরিচালিত হয়ে থাকে, কাজেই কোম্পানী চালনার জন্য তাঁকে কোনোরকম চিন্তা করতে হয় না। তিনি বছরের প্রায় তিন ভাগ সময় নিজের জাহাজ 'পর্যটন' নিয়ে সাগরবক্ষে পাড়ি জমিয়ে থাকেন। তাঁর জন্মস্থান বাংলাদেশের কোন এক অখ্যাত পল্লী, কিন্তু তাঁর সমস্ত কায়কারবার এবং কোম্পানী চিটাগাং শহরে অবস্থিত। এ শহরেই এখন তিনি বাস করেন, বিরাট বাড়ি-গাড়ী-ঐশ্বর্য—সব আছে।

অবশ্য জাহাজ 'পর্যটনে' তাঁর সব কিছু—একটা গোটা সংসারের যাবতীয় আছে। পাশাপাশি দুটো ক্যাবিনে পিতা-পুত্রী থাকেন।

জাহাজটি অত্যন্ত বড় না হলেও খুব সুন্দর এবং আধুনিক ধরণের কয়েকটি ক্যাবিন বেড্ রুম আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ডাইনিং কিচেন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় আরও ক্যাবিন আছে।

কুলী-মজুর ও খালাসীদের জন্য জাহাজের নীচের তলায় কয়েকটি ক্যাবিন—এ ক্যাবিনগুলোতে থাকে কর্মরত খালাসিগণ। নীচের তলাতেই একটি ক্যাবিনে আশ্রয় পেলো দস্যু বনহুর আর কেশব।

ক্যাপ্টেন আবু সাঈদের ক্যাবিনের পাশেই একটি বড় ক্যাবিন—সেই ক্যাবিনে থাকে আবু সাঈদের সঙ্গী-সাথী পর্যটক দল। দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোই যাদের নেশা, সংসারের বন্ধন আবদ্ধ রাখতে পারে না তাদের কোনোদিনই। আবু সাঈদের বন্ধু-বান্ধবের দল ঠিক কতকটা তাঁর মতই, তাই সখ করে অনেক সময় তাঁরাও সঙ্গী হত মিঃ সাঈদের সঙ্গে।

এবার আবু সাঈদের সঙ্গে যারা এসেছেন সবাই প্রায় বয়স্ক ভদ্রলোক, কেবল নাসের ছিলো অল্পবয়সী যুবক। নাসের আবু সাঈদের বন্ধু হাশেম চৌধুরীর ছেলে। উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মডার্ণ ছেলে। এ ছেলেটিকে আবু সাঈদ বড় পছন্দ করেন এবং ভবিষ্যতে কন্যা মিস নীহারকে সমর্পণ করবেন ওর হাতে—এই উদ্দেশ্যেই তিনি নাসেরকে পর্যটক হিসাবে সব সময় সঙ্গে রাখেন।

মিস নীহার কিন্তু নাসেরকে তেমন সমীহ করতো না, বা ভাল চোখে দেখতো না। কারণ নাসের ছিলো অত্যন্ত অসৎ চরিত্র যুবক। প্রায়ই সে নীহারকে তার প্রেমবাসনা জানাতো।

নীহার উপেক্ষা করতো তাকে, কিন্তু পিতার জন্যই কঠিন কিছু বলতে পারতো না।

নাসের শিক্ষিত ছেলে হলেও মন তার ছিলো কুৎসিত লালসাপূর্ণ এবং লোভী। তেমনি সুচতুর ছিলো সে। ভিতরের রূপটা তার কেউ সহজে ধরতে পারতো না, এমন কি জনাব আবু সাঈদ পর্যন্ত নয়। বিড়াল তপস্বীর মত নিজেকে সাধু সাজিয়ে কার্যসিদ্ধির উপায় খুঁজতো। আবু সাঈদ নাসেরের ভিতরের রূপ সম্বন্ধে না জানলেও নীহারের কাছে কিন্তু অজানা ছিলো না।

শুধু তাই নয়, নাসেরের মনে আরও একটা দূরভিসন্ধি লুকিয়ে ছিলো যা কেউ জানে না বা জানতে পারেনি। এমন কি, নাসেরের কয়েকজন দুষ্ট বন্ধুবর এই জাহাজে ছিলো—তারাও জানতো না তার মনের কথা।

বনহুর আর কেশবকে যখন জাহাজে উঠিয়ে আনা হলো তখন জাহাজের প্রায় সকলেই এসে ডেকের উপরে ভিড় জমিয়েছিলো। জনাব আবু সাঈদের

সঙ্গে তার কন্যা নীহারও এসে দাঁড়ালো। তার চোখেও বিস্ময়, পিতার মতই জানার বাসনা—কে এরা? কি এদের পরিচয়? আর এসেছেই বা কোথা হতে?

আবু সাঈদ স্বয়ং জিজ্ঞাসা করলেন—কোথাকার লোক এরা জানতে পারি কি?

যারা বনহুর আর কেশবকে বোটে তুলে নিয়ে এসেছিলো তাদের একজন জবাব দিলো, বললো—স্যার, জাহাজডুবি হয়ে এদের এ অবস্থা হয়েছে। কোথাকার লোক এখনও আমরা জানতে পারিনি।

বনহুর একবার ডেকের উপরে সকলের মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে তাকালো আবু সাঈদের মুখে, বললো—আমি নাবিক, জাহাজডুবি হয়ে আমার এ অবস্থা। আমার সঙ্গীও আমাদের জাহাজেরই একজন কর্মচারী।

সংক্ষেপে বনহুর নিজের বক্তব্য শেষ করে নিলো।

আবু সাঈদের চোখমুখ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে, তাদের জাহাজে একজন ভাল নাবিকের নিতান্ত প্রয়োজন ছিলো। নিজেদের লোকজনদের বলে দিলেন তিনি এদের প্রতি ভাল ব্যবস্থা নিতে।

পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নীহার এদের অবাক হয়ে দেখছিলো। করুণায় মন তার ভরে উঠেছিলো, না জানি কত অসহায় এরা! আসলেই নীহার ছোটবেলা হতেই ছিলো অত্যন্ত মিষ্ট-স্বভাব মেয়ে, মায়া-মমতায় ভরা ছিলো ওর হৃদয়। ব্যথিতের ব্যথা তাকে চঞ্চল করে তুলতো।

আজ বনহুর আর কেশবের অবস্থা তার মনে আঘাত করলো। পিতা তার অনুচরদের আদেশ করে চলে গেলেও নীহার গেলো না, সে দাঁড়িয়ে রইলো তাদের পাশে।

অল্পক্ষণ পরেই একজন গরম দুধ নিয়ে এলো।

নীহার তার হাত থেকে দুধের গেলাস নিয়ে নিজেই এগিয়ে ধরলো বনহুরের মুখের কাছে।

বনহুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো, একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—মেম সাহেব, আমার হাতে দিন। সত্যি আপনার কত দয়া!

বনহুরের গম্ভীর শান্ত মিষ্ট কণ্ঠস্বরে নীহার মুগ্ধ হলো। দুধের গেলাসটা বনহুরের হাতে দিয়ে, আর এক গেলাস দুধ নিয়ে কেশবের মুখে তুলে ধরলো।

কেশব অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, কাজেই নিজ হাতে খাবার মত সে সমর্থ ছিলো না। নীহারের হস্তে কেশব দুধ পান করতে লাগলো।

বনহুরের দুধ পান তখন হয়ে গিয়েছিলো, নিস্পলক নয়নে সে তাকিয়ে দেখছিলো নীহারের অপূর্ব মমতায় ভরা মুখখানা। বনহুর এমন মেয়ে জীবনে কমই দেখেছে। বিশেষ করে ধনবান দুহিতাগণ এমন হয় না।

কেশবকে যখন নীহার নিজ হস্তে দুধ পান করিয়ে দিচ্ছিলো ঠিক তখন নাসের এসে দাঁড়ালো সেখানে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো সে একবার বনহুর আর কেশবের দিকে। তারপর ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বললো—নীহার, তোমার বিবেক বলে কিছু নেই দেখছি। কোথাকার কি ছোটলোক তাদের সেবায় এগিয়ে গেছো তুমি?

কেশবের দুধ পান হয়ে গিয়েছিলো, খালি গেলাস হাতে উঠে দাঁড়ালো নীহার, চোখে রাগত দৃষ্টি নিয়ে স্থির কণ্ঠে বললো সে—নাসের সাহেব, আপনাকে আমার সম্বন্ধে এতো বেশি ভাবতে দেখে আমি দুঃখিত। আমার খুশিমত কাজ আমি করবো, এতে আপনি কোনো কথা বলতে আসবেন না।

নীহার, তোমার সম্বন্ধে আমি কেন এতো বেশি ভাবি তা তুমি নিশ্চয়ই জানো, এখানে সেকথা বুঝিয়ে বলতে চাই না। কিন্তু এসব তোমার সাজে না মনে রেখো।

বনহুর মুহূর্তে বুঝে নিলো ব্যাপারখানা, নীরবে তাকিয়ে দেখে নিলো নাসের সাহেবকে একবার।

নীহার চলে গেলো।

অন্যান্য কর্মচারী বনহুর আর কেশবকে তাদের জন্য নির্ধারিত ক্যাবিনে নিয়ে বেডে শুইয়ে দিলো। জাহাজের ডাক্তার তাদের চিকিৎসায় নিয়োজিত হলেন।

❑

কয়েক দিনেই কেশব আর বনহুর সুস্থ হয়ে উঠলো। তবু ডাক্তারের আদেশ অনুসারে আরও কয়েকদিন তাদের বিশ্রাম করতে হলো।

রোজই একবার করে বনহুর আর কেশবের ক্যাবিনে এসে খোঁজ নিতো নীহার। বনহুরের বেডের পাশে এসে দাঁড়াতো সে, জিজ্ঞাসা করতো তারা এখন কেমন আছে। ঠিকভাবে ঔষধ-পথ্যাদি খাচ্ছে কিনা ওরা তাও জেনে নিতে ভুলতো না।

নীহার যখন উদ্বিগ্নভাবে তাদের ভালমন্দ নিয়ে প্রশ্নবাদ করতো, তখন বনহুর হেসে বলতো—মেম সাহেব, আপনি বড় ভাল মেয়ে। আমরা গরীব বেচারী জেনেও আপনার দয়ার অন্ত নেই।

নীহার ওর কথা শুনে বলতো—আমার কাছে ছোট-বড় কোনো ভেদাভেদ নেই। মানুষ যে মানুষই—এর চেয়ে বেশি আমি জানতে চাই না।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে শোনে, নীহারের কথাগুলো তার অন্তর স্পর্শ করে। বলে বনহুর—মেম সাহেব, আপনি ধনবানের কন্যা হয়ে এমন, সত্যি এই দুনিয়ার সব মানুষের মন যদি আপনার মত হতো।

এমন সময় এসে দাঁড়ালো নাসের, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—নীহার, এতো বাড়াবাড়ি তোমার শোভা পায় না। সামান্য কুলি-মজুরদের ক্যাবিনে এসে একটা নিকৃষ্ট নাবিকের সঙ্গে তুমি এভাবে কথাবার্তা বলছো! তোমার আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিৎ।

মুহূর্তে নীহারের মুখ কালো হয়ে উঠলো। অধর দংশন করে বললো—আমি প্রথম দিনই বলেছি, আমার সম্বন্ধে আপনি কোনোরকম উক্তি উচ্চারণ করবেন না!

নীহার, সব তোমার আব্বাকে জানিয়ে দেবো।

তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আব্বা জানেন, তার মেয়ে কোনোদিন অন্যায় কিছু করে না। আপনি যেতে পারেন নাসের সাহেব।

রাগত দৃষ্টি নিয়ে একবার বনহুর আর কেশবের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় নাসের।

তীব্র চোখে তাকিয়ে থাকে নীহার নাসেরের চলে যাওয়া পথের দিকে।

বনহুর বলে—মেম সাহেব, কেন আপনি এখানে আসেন? উনি এতে মোটেই খুশি নন।

নীহার এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তার চোখেমুখে এক কঠিন দীপ্তভাব ফুটে উঠেছে, বললো—উনার খুশিতে আমার কিছু যায়-আসেনা; বুঝলে? আমি যখন ইচ্ছা আসবো তাতে তার কি? কথাটা বলে দ্রুত বেরিয়ে যায় নীহার।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে, তারপর বলে—কেশব, আমি জানতাম বড়লোকদের হৃদয় বলে কিছু নেই....একটু থেমে বললো পুনরায়—দেখলাম আজ মানুষের এক নতুন রূপ।

কেশব এখন অনেকটা সুস্থ, বনহুরের কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো মুখের দিকে।

❑

আবু সাঈদের 'পর্যটন' জাহাজে নাবিক বেশে শুরু হলো বনহুরের কাজ।

ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ বনহুরের কাজ দেখে মুগ্ধ হলেন। আরও মুগ্ধ হলেন তার আচরণে। এমন একজন সুদক্ষ নাবিককে তার জাহাজে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি।

অবশ্য বনহুরের নাবিকের কাজ পূর্ব হতেই জানা ছিলো। কারণ ইতিপূর্বে তাকে আরও অনেক জাহাজে থাকতে হয়েছে। তাছাড়া বনহুরের কান্দাই শহরে নিজস্ব একটি বড় এবং দু'টি ছোট জাহাজ আছে। এসব জাহাজে সে অনেক সময় নিজে নাবিকের কাজ করেছে, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না।

বনহুরের সহকারী হিসাবে কেশব আশ্রয় পেলো এই 'পর্যটনে'।

বনহুরকে সর্বক্ষণ জাহাজে ইঞ্জিনের কাছে ব্যস্ত থাকতে হতো। তেল, কালি আর কয়লার ধুয়োতে তার নাবিক ড্রেস কালিময় হয়ে উঠতো, সুন্দর দেহের স্থানে স্থানেও লাগতো কালির প্রলেপ।

জাহাজের নাবিক ছিলো না তা নয় কিন্তু তবু বড় জাহাজ— বেশি নাবিকের প্রয়োজন আবু সাঈদ তাই বনহুরকে তার জাহাজে বিনা দ্বিধায় নাবিক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

বনহুর যখন ইঞ্জিনের কাজে ব্যস্ত থাকতো তখন আবু সাঈদ স্বয়ং এসে কাজ দেখতেন, তন্ময় হতেন বনহুরের অপূর্ব কর্মদক্ষতা দেখে!

এতো কাজ থাকতে নাবিকের কাজ বেছে নেওয়ার মধ্যে বনহুরের অভিসন্ধি যে ছিলো না, তা নয়। বনহুর আর কেশব তখন ভেলায় বসে জাহাজটিকে দেখেছিলো, কেশব লক্ষ্য না করলেও লক্ষ্য করেছিলো। বনহুর—জাহাজের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'পর্যটন' শব্দটা। মুহূর্তে সে বুঝে নিয়েছিলো, এ জাহাজটি সাধারণ প্যাসেঞ্জার জাহাজ নয়। নিশ্চয়ই ভ্রমণকারী জাহাজ হবে। নূরীর-সন্ধান নিতে হলে এমনি একটি যানেরই প্রয়োজন। কাজেই আবু সাঈদ যখন তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন প্রথম নজরেই বনহুর তার পরিচয় জানতে পেরেছিলো, বুঝতে পেরেছিলো এই ব্যক্তিই অধিনায়ক।

বনহুর নিজকে এ জাহাজে স্থায়ী করে নেওয়ার জন্যই নাবিক হিসাবে পরিচয় দিয়েছিলো এবং তার অভিসন্ধি সফলও হয়েছিলো। আবু সাঈদ তাকে তাঁর জাহাজে নাবিক পদে নির্বাচিত করে নিয়েছিলেন।

বনহুর নাবিকের কাজে ব্যস্ত থাকলেও গোপনে জাহাজের সমস্ত কিছু খবরাখবর রাখতে লাগলো। সে সাবধানে সমস্ত জাহাজ অনুসন্ধান করে ফিরলো, কারণ সেদিন নূরী সেই পর্বতমালা থেকে অন্তর্ধান হয়েছিলো সেইদিন রাতে বৃক্ষশাখায় বসে সে শুনতে পেয়েছিলো জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ। তাই এ জাহাজেও বনহুর নূরীকে খুঁজে ফিরেছিলো তন্ন তন্ন করে।

বনহুর আর কেশব এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও নীহার প্রতিদিন তাদের খোজখবর নিতো। কেমন আছে ওরা—এক-দিন না জানলে সে যেন মনে শান্তি পেতো না। ওদের ভালমন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব যেন তার।

কোমল-প্রাণ নীহারের অন্তরের স্নিগ্ধ-সুন্দর অভিব্যক্তিকে উপেক্ষা করতে পারে না বনহুর। ওর সাক্ষাৎ কামনায় মন যেন উন্মুখ থাকতো বনহুরের।

বনহুর যখন ইঞ্জিনের কাজে লিপ্ত থাকতো, অদূরে এসে দাঁড়াতো নীহার, বনহুরের অজ্ঞাতে নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকতো ওর দিকে। নীহার নিজের অজান্তে কখন যে নাবিক বনহুরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলো, সে বুঝতেই পারেনি।

আজ প্রায়-সপ্তাহের বেশি হয়ে এলো বনহুর আর কেশব এ জাহাজে আশ্রয় পেয়েছে। ইতিমধ্যে পর্যটন এখনও কোথাও নোঙ্গর করেনি। সাগরবক্ষে ধরে মেরুন্দা বন্দর অভিমুখে তাদের জাহাজ এখন চলেছে। আর দুদিন পর তাদের 'পর্যটন' মেঘমুক্ত বন্দরে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

মেঘমুক্ত সচ্ছ আকাশ।

আবহাওয়া সংবাদে জানানো হয়েছে—উপস্থিত প্রাকৃতিক কোনো গোলযোগের সম্ভাবনা নেই।

আবু সাঈদের মনে খুশির উৎস। প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগের লক্ষণ না থাকলে তাঁর মন আনন্দে ভরপুর থাকতো। আবু সাঈদকে জীবনে বহুবার সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়তে হয়েছে। তাঁকে বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে পর্যটক হিসাবে। প্রাকৃতিক আবহাওয়া লক্ষণ সন্তুষ্টজনক থাকলে তাঁর খুশির অন্ত থাকতো না।

'পর্যটন' মেরুন্দা বন্দরে একদিন অপক্ষো করবে বলে ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ জানিয়েছেন।

দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ 'পর্যটন'-এর আরোহিগণ জলপথে ভেসে চলেছে। মৃত্তিকার পরশ পাবার আশায় সবাই আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। আবু সাঈদ স্বয়ং বলেছেন, এই বন্দরে তারা সম্পূর্ণ একটি দিন অবস্থান করবেন।

❑

বনহুর নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও সব সময় তার মনে নূরীর চিন্তা উদয় হচ্ছিলো। কিভাবে নূরীর সন্ধান সে পেতে পারে—কোথায় গেলে নূরীর দেখা পাবে কে জানে। ভাগ্যি এ জাহাজের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলো, নাহলে তাদের জীবন রক্ষাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। এখন জীবন যখন রক্ষা পেয়েছে তখন যেমন করে হোক নূরীকে খুঁজে বের করবেই সে। কিন্তু কোন্ দিকে, কোন্ পথে—কোথায় গেছে নূরী.....

বনহুরের চিন্তাজাল বাধা পড়ে, একটা শব্দে ফিরে তাকায় সে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে—আপনি!

ইঞ্জিন-কক্ষে বনহুর মেশিনের কাজে ব্যস্ত ছিলো; দেখলো তার অদূরে দাঁড়িয়ে আছে নীহার। বনহুর ফিরে তাকাতেই নীহার বললো—সব সময় তুমি কাজ করো আলম?

বনহুর জাহাজে নিজের নাম আলম বলেছিলো। ইতিপূর্বে আরও কতবার সে এ নামেই নিজকে পরিচিত করেছিলো, এবারও সে আলম নামটাই বেছে নিয়েছিলো নিজের জন্য। নীহারের কথায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর, একটু হেসে বললো—মালিকের কাজে ফাঁকি দেওয়া আমার নীতি নয় মেম সাহেব।

না না, আমি তা বলছি না, বলছি তোমার কি বিশ্রাম নেই!

বিশ্রাম! গরীব বেচারীদের আবার বিশ্রাম। কাজ করা আমাদের অভ্যাস, কাজেই কোনো কষ্ট হয় না।

নীহার কোনো জবাব দেয় না, ধীর মন্থর গতিতে চলে যায় সেখান থেকে।

বনহুর আপন মনেই হাসে।

আর একদিন বনহুর ইঞ্জিনের কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলো নিজের ক্যাবিনে—সমস্ত দেহে তেলকালি মাখানো। একটু অন্যমনস্কভাবেই যাচ্ছিলো সে, হঠাৎ পাশে সন্ধ্যার ঝাপসা আলোতে দেখলো, কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে চাইতেই দুটি আখির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। বনহুর বললো—মেম সাহেব আপনি!

দৃষ্টি নত করে নিয়ে বললো নীহার—এতোক্ষণে তোমার কাজ শেষ হলো বুঝি!

হাঁ মেম সাহেব।

এমন সময় নাসের এসে দাঁড়ালো সেখানে, চোখেমুখে তার কঠিন ভাব ফুটে উঠেছে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললো নাসের—নীহার, পুনরায় তুমি ঐ নিকৃষ্ট নাবিকের সঙ্গে কথা বলছো? এতোটুকু লজ্জা বোধ নেই তোমার?

নীহারও ফোস্ করে উঠলো, তীব্রকণ্ঠে বললো—লজ্জা বোধ থাকলে আপনি আর আসতেন না আমাকে সাবধান করে দিতে। কারণ আমি আপনাকে অনেক আগেই সাবধান করে দিয়েছি।

কথাটা বলে হন হন করে চলে গেলো নীহার সেখান থেকে।

বনহুরও চলে গেলো তার নিজ ক্যাবিনের দিকে।

মাঝপথে নাসের ক্রুদ্ধ পশুর ন্যায় দাঁড়িয়ে গর্জন করতে লাগলো। যত রাগ গিয়ে গড়লো বনহুরের উপর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অন্ধকারে এগিয়ে চললো।

বনহুর কিন্তু চলে গেলেও আসলে সে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলো। নাসের অন্ধকারে এগুতেই বনহুর তাকে গোপনে অনুসরণ করলো। আলগোছে সন্তর্পণে এগুতে লাগলো।

নাসের জাহাজের পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বনহুর বেশ দূরত্ব রেখে ক্যাবিনের আড়ালে আত্মগোপন করে তাকে অনুসরণ করেছে। নাসেরের চলার প্রতি এবং ভাবসাব লক্ষ্য করে বনহুরের মনে সন্দেহের দোলা জেগেছে। নিশ্চয়ই এ যুবক নীহার বা তার পিতার হিতাকাঙ্খী নয়।

কিছুদূর এগুতেই বনহুর দেখতে পেলো, ওদিকের একটা ক্যাবিনে প্রবেশ করলো নাসের। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো ক্যাবিনটার।

বনহুর এবার দ্রুতপদে ক্যাবিনের পিছনে যে শার্শী ছিলো তার পাশে এসে দাঁড়ালো। শুনতে পেলো নাসেরের গলার আওয়াজ, বলছে সে—শম্ভু, ঐ নাবিক বেটাকে প্রথমে সরাতে হবে।

একটা হেড়ে কর্কশ কণ্ঠস্বরে শোনা গেলো—কার কথা কইছেন স্যার? ঐ নতুন নাবিকটার কথা?

হাঁ, শম্ভু ঐ বেটা জাহাজে আসার পর আমি লক্ষ্য করেছি—নীহার যেন কেমন আনমনা হয়ে গেছে। বেটার সৌন্দর্য ওর হৃদয়ও জয় করে নিয়েছে মনে হচ্ছে।

ঠিক বলেছেন স্যার। ছোটলোক নাবিকের চেহারা এমন হয়—এর পূর্বে দেখিনি।

দেখোনি, কিন্তু জানো আমার সব অভিসন্ধি এবার ওর জন্য বিনষ্ট হবে? নীহারকে আমি চাই আর তার সঙ্গে চাই নীহারের পিতার বিপুল ঐশ্বর্য।

স্যার, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আপনি যখন হুকুম করবেন তখনই আমি নীহারকে আপনার মুঠায় এনে দিতে পারি।

কিন্তু আমি জোর করে তার ভালবাসা আদায় করতে চাই না শম্ভু। কৌশলে তার ভালবাসা আদায় করে তার সমস্ত সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী হতে চাই।

এবার শোনা যায় আর একটি কণ্ঠস্বর—স্যার, আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি আমরা। আপনার সামান্য ইংগিতে সমস্ত জাহাজে আমরা আগুন ধরিয়ে দিতে পারি। বলুন ক্যাপ্টেনকে কিভাবে হত্যা করতে হবে?

থামো। এখনও সে সময় আসেনি। তার পূর্বে ঐ নাবিক বেটাকে সরাতে হবে.....শম্ভু?

বলুন স্যার?

আমার কথা শুনেছো?

হাঁ স্যার, সব শুনেছি।

বনহুর এবার দ্রুত সরে এলো ক্যাবিনের পিছন থেকে। এখন তার চোখের সম্মুখে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে এলো, কি সাংঘাতিক শয়তান লোক নাসের বুঝতে পারলো সে।

ক্যাবিনে এসে বনহুর দেখলো কেশব তার বিলম্ব দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই বললো কেশব—বাবু, এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বিশেষ একটু কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। কথাটা বলে তোয়ালে আর সাবান নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করে বনহুর। পাইপের ঠান্ডা পানিতে বেশ করে গোসল করতে লাগলো সে। যতক্ষণ দেহের তেল কালি সাবান লাগিয়ে পরিষ্কার করছিলো ততক্ষণ তার মস্তিস্কে একটা গভীর চিন্তার আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছিলো। নাসেরকে যতখানি শয়তান মনে করেছিলো, তার চেয়ে শত সহস্র গুণ বেশি শয়তান সে। এ জাহাজে ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ মোটেই নিরাপদ নন, নিরাপদ নয় তাঁর কন্যা নীহার। এমন একটা দুষ্ট বিষ-কীটকে তারা তাঁদের জাহাজে সানন্দে গ্রহণ করেছে যে কীট তাদের দংশন আশায় প্রহর গুণছে। বনহুর যতই ভাবছে ততই বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। নাসেরকে সে এর উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

ফিরে আসে বনহুর বাথরুম থেকে।

এমন সময় তাদের খাবার টেবিলে ডাক পড়ে।

কেশব আর বনহুর বেরিয়ে যায়, নীচের একটা বড় ক্যাবিনে জাহাজের কুলি খালাসী আর নাবিকদের খেতে দেওয়া হয়। টেবিলে এসে বসে বনহুর আর কেশব।

টেবিলে খাবার দেওয়ার পূর্বে হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে যায় অদূরে ক্যাবিনের দরজায়—কে একজন লোক বাবুর্চির কানে কিছু বলে দ্রুত সরে গেলো।

বাবুর্চি একটু পরে খাবার হস্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করলো! বনহুর বাবুর্চির মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কেমন যেন ভীত ভাব লক্ষ্য করলো সে তার মুখমন্ডলে। হাতের একখানা প্লেট নামিয়ে রাখলো বাবুর্চি বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর প্লেটখানা নিজের দিকে টেনে নিতেই ভাত আর মাংসগুলো ক্যাবিনের মেঝে ঢেলে পড়ে গেলো।

বাধ্য হয়ে বাবুর্চি তাকে অন্য আর এক প্লেট খাবার দিলো। বনহুর তৃপ্তি সহকারে খেতে শুরু করলো। কিন্তু খেতে খেতে বনহুর লক্ষ্য করলো—বাবুর্চির মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

সেই রাতেই জাহাজ থেকে উধাও হলো বৃদ্ধ বাবুর্চি।

সমস্ত জাহাজের একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো, কোথায় গেলো, কি হলো সে। বিশেষ করে আবু সাঈদ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর বৃদ্ধ বাবুর্চিকে পাওয়া গেলো না।

❑

পাহাড়িয়া ঝরণা এবং জলপ্রপাতের বিভিন্ন দৃশ্য গ্রহণের পর পরিচালক আসলাম আলী তাঁর ইউনিটসহ ফিরে চলেছেন বোম্বের দিকে। পথে আরও কতকগুলো বন-জঙ্গলের দৃশ্যও গ্রহণ করেছেন তাঁরা। ছবির আউট ডোর সুটিং প্রায় শেষ হয়ে গেছে। বাকি অংশের কাজ হবে ষ্টুডিও ফ্লোরে।

প্রত্যাবর্তন কালে পরিচালক আসলাম আলী কয়েকদিনের জন্য মেরুন্দা বন্দরে তাদের জাহাজ নোঙ্গর করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন হলো তারা বোম্বে ত্যাগ করে দূর-দূরান্তে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ইউনিট অত্যন্ত পরিশ্রান্ত—কাজেই তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন।

আসলাম আলীর যাত্রা এবার অত্যন্ত শুভ। পাহাড়িয়া ঝরণা এবং জলপ্রপাতের যে দৃশ্যগুলো তিনি এবার গ্রহণ করতে পেরেছেন তা অত্যন্ত সুন্দর ও অপূর্ব হয়েছে। শুধু দৃশ্য গ্রহণেই তিনি জয়ী হননি, লাভ করেছেন অপ্সরী সমতুল্যা বনকুমারীকে।

আসলাম আলীর হৃদয়ে অদ্ভুত বাসনা, কোনক্রমে ঐ বনকুমারীকে যদি বশে আনতে পারে তাহলে তাঁর ছবির জন্য আর নায়িকার অন্বেষণে হা হুতাশ করে মরতে হবে না। হাজারে এমনি একটি মেয়ে নজরে পড়ে কিনা সন্দেহ।

নূরীই হলো সেই বনকুমারী।

নূরীকে জাহাজে আনার পর থেকে চলেছে তাকে সাধ্য-সাধনা! কিসে সে খুশি হবে, কিসে তার মন সচ্ছ স্বাভাবিক হবে—সব সময় সেই চেষ্টা চলেছে।

এ জাহাজে নূরীর সেবা-যত্নের ত্রুটি নেই। সুন্দর সুসজ্জিত একটি ক্যাবিনে নূরীকে রাখা হয়েছে। মূল্যবান পরিচ্ছদে তাকে সজ্জিত করা হয়েছে। নানাবিধ খাদ্যসম্ভারে তার সম্মুখস্থ টেবিল পরিপূর্ণ। ইউনিটের প্রতিটি লোক নূরীকে খুশি করার জন্য উন্মুখ রয়েছে। কিন্তু এতো করেও কেউ নূরীর মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়নি।

স্বয়ং আসলাম আলী নিজেও নূরীর জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সর্বক্ষণ নূরীর সুখ-সুবিধার জন্য ব্যাপৃত তিনি। নিজে এসে তাকে বলে বলে খাওয়ান সস্নেহ মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেন।

এতো করেও নূরীর চোখের অশ্রু শুষ্ক হয় না। এতো পেয়েও সে সন্তুষ্ট নয়। করুণ বিষন্ন মুখমন্ডল, ম্লান দুটি ডাগর আঁখি। স্তিমিত তার মুখের হাসি।

পরিচালক নূরীকে পেয়ে যেমন খুশি হয়েছেন, তেমনি হয়েছেন চিন্তিত। এতো করেও কিছুতেই নূরীকে বশে আনা সম্ভব হচ্ছে না তাদের।

অনেক সাধ্য-সাধনা করে যদিও নূরী সামান্য কিছু খাবার মুখে দিয়েছে কিন্তু আজও একটি কথাও সে বলেনি কারো সঙ্গে। এমনকি নিজের নামটাও ব্যক্ত করেনি সে।

এ জাহাজে নূরী যেম একটি আজব জীব।

নূরীকে জাহাজে নিয়ে আসার পর ইউনিটের সবাই তাকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলো। নূরীর চেহারা স্বাভাবিক বাঙ্গালী মেয়ের মত ছিলো না অদ্ভুত অপূর্ব চেহারা ছিলো তার। কতকটা ইরানী মেয়েদের মত দেখতে ছিলো সে। মাথার চুল ঘন লালচে এবং কোঁকড়ানো! তরবারীর মত বাঁকানো দুটি ভ্রূযুগল। ডাগর ডাগর হরিণ চোখে মোহময় দৃষ্টি। ছিপছিপে লম্বা গড়ন, উন্নত নাসিকা, সরু ওষ্ঠদ্বয়।

নূরীকে দেখলে সহজে কেউ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না। ওকে যত দেখা যায়, ততই যেন আরও দেখতে ইচ্ছে করে। এহেন নূরী যে চিত্র পরিচালকদের নিকটে কত আখাঙ্ক্ষিত তা সহজেই অনুমেয়।

❑

মেরুন্দা বন্দরে পরিচালক আসলাম আলীর জাহাজ ক'দিন হয় নোঙ্গর করে আছে। ছবির সমস্ত ইউনিট বন্দরে অবতরণ করে ঘুরে ফিরে দেখে নিচ্ছে বন্দরটাকে। কারণ এসব অঞ্চলে সচরাচর তারা আসে না এবং ভবিষ্যতে পুনরায় আসবে কিনা তারও ঠিক নেই।

মেরুন্দা বন্দর পাহাড়িয়া অঞ্চল।

উঁচুনীচু টিলার পাশ কেটে বয়ে চলেছে এই নদীটি। ঠিক সুন্দর একটা ছবির মত দেখতে মেরুন্দা। কালো কালো পাথুরিয়া টিলার উপরে সাদা ধরধবে ছোট ছোট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়িগুলো দেখবার মত জিনিষ। কতকগুলো টিলার পাশ কেটে সচ্ছ ঝরণাধারা নেমে এসে মিশে গেছে সাগরবক্ষে।

সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত কালে এসব অঞ্চল অপূর্ব রূপ ধারণ করে। সচ্ছ জলরাশির বুকে ভোরের আলোকরশ্মি সৃষ্টি করে এক মহাসমারোহ। তেমনি বেলাশেষের সূর্যের আলো সোনালী বন্যায় ছেয়ে দেয় সব কিছু।

আসলাম আলীর ইউনিট মুগ্ধ হয়ে যায় এসব দেখে। সম্পূর্ণ তিন দিন তারা মেরুন্দা বন্দরে অপেক্ষা করার পর আজ তাদের শেষ দিন।

নূরী ক্যাবিনে বসে তাকিয়ে থাকে মেরুন্দা বন্দরের দিকে। অগণিত লোকজনের চলাফেরার মধ্যে তার দৃষ্টি খুঁজে ফেরে একজনকে—সে হল তার প্রিয়তম দস্যু বনহুর। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে নূরী।

আসলাম আলীর ছবির নায়িকা শ্যামারাণী মাঝে মাঝে নূরীর কাছে এসে বসতো। নূরীকে সে ঈর্ষা না করে ভালোবাসতো, নূরীর নীরব অশ্রু তার মনে সৃষ্টি করতো একটা ভাবের উন্মেষ। ওর কাছে বসে পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্তনা দিতে চেষ্টা করতো সে। জানতে চাইতো ওর মনের কথা।

নূরী ওর সঙ্গে কোনো কথা না বললেও ওকে নূরীর ভাল লাগতো। মেরুন্দা আসার পর যখন শ্যামারাণী নূরীকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলো—বোন, আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি। তোমার দুঃখ আমাকে বিচলিত করে, বলো তোমার কি দুঃখ?

এতোদিন নূরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো শুধু শ্যামারাণীর দিকে, কোনো জবাব দিতো না তার প্রশ্নের। আজ নূরী চুপ থাকতে পারে না, ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠে নূরীর।

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে শ্যামারাণী—বলো? বলো তুমি কি বলতে চাও?

নূরীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা, বলে নূরী—কেন তোমরা আমাকে ধরে নিয়ে এলে? বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ওর গলা।

নূরীর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে শ্যামারাণী, আঁচলে ওর চোখের পানি মুছে দিয়ে বলে সে—তোমাকে আমাদের পরিচালকের অনেক পছন্দ হয়েছে। তোমাকে তিনি ছবির নায়িকা করবেন।

অবাক হয়ে বলে নূরী—পরিচালক! কিসের ছবি?

ছায়াছবি—চলচ্চিত্র....

মাথা নাড়ে নূরী, বলে—ওসব আমি বুঝি না।

সব বুঝতে পারবে। আমাদের ষ্টুডিওতে গেলে সব দেখতে পাবে।

না না, তোমরা আমাকে সেই বনে ফিরিয়ে দিয়ে এসো আমি তার কাছে যাবো—আমি তার কাছে যাবো।

কে সে? কার কথা বলছো?

আমার হুর। আমার হুরের কাছে।

হুর! সেকি?

নূরীর কথা বুঝতে পারে না শ্যামারাণী। তবু নূরী যে কথা বলেছে এই তার আনন্দ। ছুটে যায় শ্যামারাণী পরিচালক আসলাম আলীর কাছে।

শ্যামাকে আনন্দদীপ্ত দেখে আসলাম আলী জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার, বড় আনন্দমুখর দেখছি যে?

ব্যাপার অত্যন্ত শুভ। আপনার শিকার কথা বলেছে।

আসলাম আলী অবাক হয়ে বললেন—আমার শিকার!

হাঁ, সেই বনকুমারী....

সত্যি বলছো শ্যামা?

মোটেই মিথ্যা নয়। বলুন কি পুরস্কার দেবেন আমাকে? কারণ আমিই তাকে প্রথম কথা বলতে বাধ্য করেছি।

যা চাও তাই পাবে শ্যামা, ওকে যদি তুমি আমার কাছে লাগিয়ে দিতে সহায়তা করো।

সত্যি দেবেন?

সত্যি।

আমার হাত ধরে শপথ করুন। হাতখানা প্রশস্ত করে দেয় শ্যামা পরিচালকের সম্মুখে।

আসলাম আলী হাত রাখেন শ্যামার হাতের উপর—বলো কি চাও তুমি?

শ্যামা ফিক করে হেসে বলে—বেশি কিছু নয়, আপনার স্নেহপ্রীতি আর আন্তরিকতা।

কথা দিলাম এসব থেকে কোনোদিন তুমি বঞ্চিত হবে না।

শ্যামারাণীর চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললো—এর বেশি আমি কিছুই চাই না আলী সাহেব। আমি পতিতার মেয়ে জেনেও, আমাকে আপনি আপনার অন্তরে স্থান দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, লোকসমাজের সম্মুখে তুলে ধরেছেন শ্রেষ্ঠ নায়িকা হিসাবে—এর চেয়ে আর আমার কি লোভনীয় থাকতে পারে!

শ্যামারাণীর চোখ দুটো অশ্রু ছলছল হলো, কণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

আসলাম আলী তাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে আবেগভরা গম্ভীর শান্ত কণ্ঠে বললেন—আমার কাছে তুমি চিরদিন আদরিণীই থাকবে শ্যামা। তোমার শ্যামল রূপ যে আমাকে আত্মহারা করেছে। আমি তোমায় প্রাণের অপেক্ষা বেশি ভালবাসি।

আলী সাহেব! আলী সাহেব! আপনি কতবড়, কত মহান। শ্যামা আসলাম আলীর বুকে মাথা রাখে।

আসলাম আলী শ্যামাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে প্রেমবাণী শোনালেও তার মনের গহনে বিরাজ করছে আর একটি মুখ। সে হলো গহন জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সেই রত্ন, তার অন্তরের রাণী বনকুমারী।

আসলাম আলী সুচতুর বুদ্ধিমান পরিচালক—কেমন করে শিল্পী এবং কলা-কৌশলীদের খুশি রাখতে হয় জানেন। অভিজ্ঞ পরিচালক হিসাবে তার খ্যাতি কম নয়। তিনি খাটি বাঙ্গালী এবং মুসলমান হয়েও নানাদেশীয় শিল্পীদের সমন্বয়ে চিত্র তৈরী করে থাকেন। শুধু বাংলা ছবিই নয়, উর্দু এবং পাঞ্জাবী ছবিও তৈরী করে চিত্রজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন।

নূরীকে নিয়ে আসলাম আলীর মনে এক উদ্ভব হয়েছে, যা অনেক পরিচালকের পক্ষে সম্ভব হয়নি আজও।

শ্যামার সঙ্গে আসলাম আলী চললেন নূরীর ক্যাবিনের দিকে। আজ নূরী কথা বলেছে—এ যেন তার চরম আনন্দের কথা। খুশিতে উজ্জল তাঁর মুখমন্ডল, দীপ্ত কণ্ঠে বললেন—শ্যামা, ওকে আমার সম্মুখে কথা বলাতে পারবে?

পারবো, চলুন। কিন্তু আপনি বাইরে অপেক্ষা করবেন, আমি ক্যাবিনে প্রবেশ করে তার সঙ্গে কথা বলবো।

বেশ তাই হবে।

পরিচালক আসলাম আলী ক্যাবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্যাবিনে প্রবেশ করলো শ্যামারাণী।

নূরী তখন ক্যাবিনের মুক্ত গবাক্ষে তাকিয়ে আছে মেরুন্দা বন্দরে থেমে থাকা অন্যান্য জাহাজের দিকে।

শ্যামা এসে নূরীর কাঁদে হাত রাখলো, বললো—কি দেখছো তুমি?

ফিরে তাকায় নূরী, ম্লান হেসে বলে সে—দেখছি পৃথিবীর মানুষ কত নিষ্ঠুর!

নূরীর কণ্ঠস্বর এবং কথা বলার অপূর্ব ভঙ্গী পরিচালকের মনে আনন্দের উৎস বইয়ে দিলো, মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো তাঁর মুখে! পরক্ষণেই ভেসে আসে শ্যামার কণ্ঠ—কি করে বুঝলে তুমি পৃথিবীর মানুষ বড় নিষ্ঠুর?

আমার নিজের জীবন দিয়ে। আচ্ছা বোন, তোমার জীবনের সব কথা বলবে আমাকে?

বলবো, কিন্তু আজ নয়।

কবে বলবে তুমি?

আর একদিন।

তোমার নামটা তো আজও বললে না বোন?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলে নূরী—আমার নাম বড্ড মন্দ আর অপেয়।

বলোই না কি নাম তোমার?

নূরী।

চমৎকার নাম.....কথাটা বলে কক্ষে প্রবেশ করেন আসলাম আলী।

নূরীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠে, মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

আসলাম আলী পাশে এসে দাঁড়ান! —স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন— নূরী.....কি সুন্দর, কি মিষ্টি নাম তোমার। আমি কিন্তু তোমাকে রত্না বলে ডাকবো।

শ্যামা হেসে বলে—বাঃ এ যে আরও মধুর, যেমন রূপ তেমনি নাম।

নূরী কোনো কথা বলে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো যেমন ছিলো ঠিক তেমনি।

আসলাম আলী বললেন—রত্নার সমস্ত দেহ আমি রত্ন দিয়ে ভরে দেবো শ্যামা। আমার বাসনা যদি সিদ্ধ হয়—যেমন তুমি আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ করেছো।

শিউরে উঠে নূরী, ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ তুলে আসলাম আলীকে দেখে নেয় সে।

আসলাম আলী তখনও বলে চলেছেন—বোম্বে ফিরে গিয়ে রত্নাকে তুমি তোমার মত করে তৈরী করে নিও।

হঠাৎ বলে উঠলো শ্যামা—মেরুন্দা ছেড়ে কবে আমরা বোম্বের দিকে রওয়ানা দেবো আলী সাহেব?

আজই আমরা মেরুন্দা বন্দর ত্যাগ করবো শ্যামা।

আজই!

হাঁ। তোমরা বিদায়ের জন্য তৈরী হয়ে নাও শ্যামা কোনো প্রয়োজনীয় দ্রবাদির অভাব মনে করলে মেরুন্দা হতে ক্রয় করে নিতে পারো।

পরিচালক আসলাম আলী নূরীর কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামা নূরীকে বললো—বোন, মেরুন্দার অপরূপ দৃশ্য সত্যি অপূর্ব! চলো যাই, ডেকে গিয়ে দাঁড়াই।

নূরী বিনা বাক্যে শ্যামাকে অনুসরণ করলো। আজ কতদিন সে বাইরের আলোয় গিয়ে দাঁড়ায়নি! প্রথম যেদিন তাকে জোরপূর্বক ধরে এনে ঐ যে ক্যাবিনে ভরেছে তারপর আর সে বাইরে আসেনি। পৃথিবীর আলো যেন তার চোখে অসহ্য লাগতো, ভালো লাগতো না কিছু। তাই নূরী কোনোদিন ক্যাবিনের বাইরে তাকিয়েও দেখেনি।

আজ শ্যামার সঙ্গে এসে ডেকের উপর দাঁড়ালো নূরী। মেরুন্দা বন্দর ত্যাগ করার ভোঁ বেজে উঠেছে, একটু পরেই জাহাজ বন্দর ত্যাগ করবে।

করুণ অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে নূরী মেরুন্দার শেষ প্রান্তে দূরে—অনেক দূরে ঘন জঙ্গলের শীর্ষভাগে। ভাবে সে, নিশ্চয়ই তার বনহুর ঐ পর্বতমালার উপরে জঙ্গলে এখনও বুঝি তার নাম ধরে ডেকে ফিরছে। হয়ত

আবার সেই জংলীদের কবলে ধরা পড়ে গেছে। না হয় জংলীরাণী তাকে বন্দী করে হত্যা করে ফেলেছে। কি নৃশংস হত্যা......নূরী আর যেন ভাবতে পারে না, তার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠে। নূরীর চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে রংলালের দলের ঝুলন্ত অবস্থায় মস্তকহীন মৃতদেহগুলো! ভেসে উঠে সাপুড়ে সর্দারের ভয়ঙ্কর মৃত্যুদৃশ্য।

নূরীর মাথার মধ্যে যখন জংলীদের পৈশাচিক হত্যাকান্ডের বীভৎস দৃশ্যগুলো প্রতিচ্ছবি ঘুরপাক খাচ্ছিলো তখন তাদের জাহাজ মেরুন্দা বন্দর ত্যাগ করে ধীরে ধীরে সরে আসছিলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজ 'পর্যটন' এগিয়ে আসছে বন্দরের দিকে। পরিচালক আসলাম আলীর জাহাজের পাশ কেটে মন্থর গতিতে বন্দর অভিমুখে এগুচ্ছে জাহাজখানা।

নূরী বললো—আর আমি দাঁড়াতে পারছি না। চলো ক্যাবিনে যাই।

শ্যামা ব্যস্তকণ্ঠে বললো—কি হয়েছে?

বড় অসুস্থ বোধ করছি।

শ্যামা নূরীকে নিয়ে ফিরে গেলো ক্যাবিনের মধ্যে।

'পর্যটন' তখন অতি নিকটে এসে পড়েছে। একেবারে আসলাম আলীর জাহাজের পাশে।

নাবিক বেশে বনহুর তখন ডেকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা মেরুন্দা বন্দর লক্ষ্য করছিলো! শুধু বন্দর লক্ষ্য করাই তার আসল উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য ছিলো বন্দরে থেমে থাকা প্রত্যেকটা জাহাজ অনুসন্ধান করে দেখা। হঠাৎ যদি কোনো জাহাজে তার নূরী থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পাবে সে। চঞ্চলা নূরী কিছুতেই জাহাজের ক্যাবিনে চুপচাপ বসে থাকার মেয়ে নয়। কিন্তু বনহুরের আশা সফল হয় না—নূরী ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজের কেবিনে চলে যায়!

বনহুর ব্যাকুল চোখে দেখেছিলো, অনুসন্ধান করে ফিরছিলো তার প্রিয়ার। নূরী তখন ক্যাবিনে গিয়ে শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়েছে।

নূরীকে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে শ্যামা ফিরে আসে ডেকে একটু পূর্বে যেখানে নূরী আর সে দাঁড়িয়েছিলো। হঠাৎ শ্যামার নজর চলে যায় পাশের জাহাজের ডেকে বনহুরের উপর।

বনহুরও তাকিয়ে দেখছে শ্যামাকে।

একেবারে তখন জাহাজ দু'খানা পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

নাবিকের ড্রেসে বনহুর—বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে!

শ্যামা নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে নাবিকটির দিকে। এই মুহূর্তে যদি নূরী চলে না যেতো তাহলে নিশ্চয়ই বনহুরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ? হয়ে

যেতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবই ভাগ্য। যতটুকু যার অদৃষ্টে আছে তা থেকে কেউ কাউকে বাঁচাতে পারবে না। এই দন্ডে বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার ভাগ্যে নেই, কাজেই সে চলে গেলো ডেক ছেড়ে ভিতরে।

জাহাজখানা ক্রমান্বয়ে সরে যেতে থাকে দূরে সাগরবক্ষে আর 'পর্যটন' এগিয়ে যায় মেরুন্দা বন্দরের অভিমুখে!

শ্যামার হঠাৎ কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠে। বনহুরকে যতক্ষণ সে ডেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছিলো ততক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলো শ্যামা ওর দিকে। কিন্তু যেইমাত্র আর নজরে পড়লো না তখন চলে এলো নূরীর ক্যাবিনে, কারণ এ ক্যাবিনের মুক্ত গবাক্ষে পিছন জাহাজের ডেক সম্পূর্ণ দেখা যাবে।

শ্যামা এসে দাঁড়ালো ক্যাবিনের পিছন জানালায়। সত্যি এখনও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঐ তো লোকটা দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাদের জাহাজখানার দিকে। তবে কি তাকেও ওর ভাল লেগেছিলো? না হলে অমন করে নির্বাক দৃষ্টি মেলে এখনও এ জাহাজখানার দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন! শ্যামার মনে একটা আনন্দের অনুভূতি সাড়া দিয়ে যায়—সত্যি একটা স্মরণীয় পুরুষ মুখ আজ সে দেখতে পেয়েছে। যে মুখ তার জীবন পাতায় একটি স্বর্ণরেখোর মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ধীরে ধীরে জাহাজখানা সম্পূর্ণ দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত হলো।

শ্যামার মুখ ম্লান হলো যেন সন্ধ্যার অন্ধকারের মত। মুক্ত জানালাপথ থেকে ফিরে এলো। নূরী তখন বালিশে মুখ গুজে নিশ্চুপ পড়েছিলো।

শ্যামা এসে বসলো নূরীর কাছে, পিঠে হাত রেখে ডাকলো—রত্না!

নূরী মুখ তোলে, কিন্তু কোনো জবাব দেয় না।

বলে আবার শ্যামা—রত্না, জানো এতোক্ষণ আমি তোমার ক্যাবিনের জানালায় দাঁড়িয়ে কি দেখছিলাম?

কি দেখছিলে?

দেখছিলাম এক সৌম্যসুন্দর দীপ্তকায় যুবককে। সত্যি অপূর্ব সে চেহারা......

নূরীর মনে হঠাৎ একটা প্রশ্ন জাগে, কে সে যুবক—তার বনহুর নয়তো? সোজা হয়ে বসে নূরী বলে—কেমন দেখলে তাকে? ছেড়া জামাকাপড় দেখলে? মাথার চুল বুঝি রুক্ষ? মুখে বুঝি খোঁচা খোঁচা দাড়ি....

শ্যামা বলে উঠে—না না, ছেড়া জামা হবে কেন। রুক্ষ চুলই বা কেন হবে। আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িই বা থাকবে কেন? সে যে জাহাজের নাবিক—তার দেহে নাবিকের ড্রেস, মাথায় নাবিকের ক্যাপ। সৌম্যসুন্দর অপরূপ সে নাবিক!

নাবিক! হতাশায় নূরীর মন ভরে উঠে। কে কোন নাবিক—কি হবে তার সংবাদ জেনে!

শ্যামার চোখেমুখে তখনও লেগে রয়েছে ভাবের উন্মেষ। তার অন্তর জুড়ে নাবিকের প্রতিচ্ছবি ভাসছে। মাত্র ক্ষণিকের জন্য শ্যামা দেখেছে তাকে কিন্তু ওর যেন মন হচ্ছে—কত দিনের চেনা ঐ মুখ।

জাহাজ তখন মেরুন্দা বন্দর ছেড়ে অনেক এগিয়ে এসেছে।

এদিকে 'পর্যটন' এসে নোঙ্গর করলো মেরুন্দা বন্দরে। নীহারের আনন্দ আর ধরে না। আবু সাঈদ স্বয়ং কন্যাসহ বন্দরে অবতরণ করবেন বলে প্রস্তুত হয়ে নিলেন।

জাহাজের প্রায় সকলেই বন্দরে অবতরণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছে। নাসের এৰং তার গোপন অনুচরগণ সেই ফাঁকে একটা কুমতলব এঁটে নিলো। জাহাজ আজ বেশ কিছুদিন অবিরত একটানা চলার পর মেরুন্দায় নোঙ্গর করেছে। ইঞ্জিনের মেশিনপত্র পরিস্কারের প্রয়োজন। হেড নাবিক জানিয়েছে—সে কয়েকজন সহকারী নিয়ে ইঞ্জিন পরিষ্কার কাজে লিপ্ত হবে। কাজেই সবাই জাহাজ ত্যাগ করে বন্দরে অবতরণ করা চলবে না।

আবু সাঈদ বললেন—হ্যাঁ, সেই মতই কাজ করতে হবে। কারণ মেরুন্দা বন্দর ত্যাগ করার পর নিকটবর্তী কোনো বন্দরের সম্ভাবনা নেই। সেজন্য জাহাজের নাবিকগণকে হেড নাবিককে সহায়তা করতে বললেন। পরে তারা একদিন মেরুন্দা বন্দরে অবতরণ করতে পারবে বলে জানালেন তিনি।

নাসেরের চোখেমুখে খুশির উৎস বয়ে গেলো। এই তো সুযোগ, নাবিক আলমকে কাবু করতে হবে এইবার।

আবু সাঈদ যখন দলবল নিয়ে বন্দরে অবতরণ করলেন তখন আলগোছে সরে রইলো নাসের আর তার কয়েকজন দুষ্ট অনুচর ।

আবু সাইদ যখন তার পর্যটক বন্ধুদেরকে নিয়ে মেরুন্দা বন্দরে নেমে গেলেন, ঠিক তার পর মুহূর্তে নাসের আর তার দু'জন শয়তান অনুচরসহ হেড নাবিকের পাশে এসে দাঁড়ালো।

হেড নাবিক তখন একা চা পান করছিলো তার ক্যাবিনে বসে। নাসের এবং তার দু'জন অনুচরকে দেখে উঠে দাঁড়ালো।

বললো নাসের—মকবুল, জানো কেন এসেছি?

না জনাব, আমি কেমন করে জানবো বলুন?

তোমাকে এক কাজ করতে হবে মকবুল।

বলুন স্যার? কি কাজ করতে হবে?

এ জাহাজে আমার এক দুশমন আছে, তাকে সরাতে হবে, পারবে সরাতে?

স্যার, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না?

নাসের সঙ্গীদ্বয়ের মুখে তাকিয়ে দেখে নিয়ে চাপা কণ্ঠে বললো—নাবিক আলম আছে না?

নতুন নাবিক আলমের কথা বলছেন স্যার?

হাঁ, জানো এই অল্প ক'দিনে সে জাহাজের মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে।

ঠিক বলেছেন, ছেলেটা ভাল কাজ করে।

কিন্তু তোমার বদনাম হচ্ছে তা জানো?

বদনাম। আমার বদনাম? কি বলছেন স্যার?

হাঁ সে এখন তোমার নাবিক নামে কলঙ্ক আঁকবে। ভাল কাজ দেখিয়ে তোমাকে সে নীচে নামিয়ে প্রমোশন নেবে সে। দুদিন পরে দেখবে আলম হেড নাবিক বনে বসে আছে।

নাসেরের কথা শুনে হেড নাবিক মকবুলের মনে একটা সন্দেহের দোলা জাগে তাই তো, আলমের কাজ দেখে প্রায়ই মালিক তার প্রশংসা করেন। হয়তো একদিন তার এই পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতা ব্যর্থ হয়ে যাবে ঐ ছোকরা নাবিকের কাছে। বললো মকবুল—বলুন স্যার, আমাকে কি করতে হবে?

অত্যন্ত সহজ কাজ এবং সেই কাজের উপর নির্ভর করছে তোমার নাবিক-জীবনের ভবিষ্যৎ?। তাছাড়াও আমি তোমাকে মোটা বখশীস দেবো। আর যদি কাজের আপত্তি করো বা কাউকে একথা বলে দাও তাহলে.....একটা সুতীক্ষ্ণ ছোরা পকেট থেকে বের করে মেলে ধরে তার সম্মুখে—তাহলে এটা আমূলে বিদ্ধ হবে তোমার ঐ প্রশস্ত বুকে।

মকবুলের চোখে ভীতি এবং উৎকুণ্ঠা ভাব জেগে উঠে। বসে সে—যা বলবেন আমি তাই করতে রাজী আছি স্যার।

নাসের তার সঙ্গীদ্বয়কে ইঙ্গিত করলো কথাটা বলার জন্যে। লোক দুটো চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর একজন বললো—মকবুল, আজ থেকে তোমাদের ইঞ্জিন পরিস্কার করবার জন্য নির্দেশ দেবে। যখন সে ইঞ্জিন পরিস্কারে নিয়োজিত হবে তখন হঠাৎ ভুল করে তুমি ইঞ্জিন চালু করে দেবে।

স্যার! ভয়ার্ত বিবর্ণ মকবুলের মুখমন্ডল।

কোনোরকম আপত্তি করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। বললো নাসের। তখনও তার হাতে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা চক্চক্ করছে। নাসের পুনরায় কথাটা মকবুলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সঙ্গীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

মকবুল পুনরায় বসে পড়লো তার পরিত্যক্ত আসনে। ঠান্ডা চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো—এ কি করে সম্ভব হবে! একটা নিষ্পাপ সুন্দর জীবনকে সে কি করে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলবে। জানে মকবুল—আলমকে ইঞ্জিনের কাজে দিয়ে সে ইঞ্জিন চালু করে দিলে মাত্র এক সেকেন্ড—তাহলেই পিষে যাবে ওর দেহটা মেশিনের দাঁতের মধ্যে। কি ভয়ঙ্কর নৃশংস মৃত্যু.....মকবুলের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠলো না না, সে পারবে না এ কাজ করতে। কিন্তু পরক্ষণেই নাসেরের কঠিন কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হলো কোনো রকম আপত্তি করলে মৃত্যু অনিবার্য। সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা ভেসে উঠলো চোখের সম্মুখে—নাসেরের কথা অমান্য করলে তার মৃত্যু সুনিশ্চয়।

পায়চারী করতে লাগলো মকবুল, বয়স তার কম নয়। প্রায় পঞ্চাশের অধিক হবে। তিনভাগ জীবন গত হয়ে গেছে। আর একভাগ অবশিষ্ট রয়েছে! তার জন্য একটি পূর্ণ জীবন নষ্ট করবে? আলম সবেমাত্র যুবক—সুন্দর সুষ্ঠু একটি মানবদেহ। ওর মনে কত আশা আছে, বাসনা আছে—সম্মুখে পড়ে রয়েছে দীর্ঘচলার পথ। আর তার জীবন তো শেষ হয়ে গেছে, পথ চলা ক্ষান্ত হয়ে আসছে। ক্লান্ত পথিক সে, আর ক'দিন সে পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করবে! তার জীবনের বিনিময়ে একটি জীবন যদি বাঁচে ক্ষতি কি। না না, সে পারবে না আলমকে ইঞ্জিনের যাতা মেশিনে নিষ্পেষিত করতে। পারবে না সে এতোবড় নিষ্ঠুর অমানুষিক কাজ করতে।

মকবুল যখন দুর্ভাবনায়-দুশ্চিন্তায় উন্মত্ত প্রায় তখন আলমবেশী বনহুর এলো তার খোঁজে। মকবুলকে আলম চাচা বলে ডাকতো। কারণ বনহুর জানতো, মকবুলকে খুশি রাখতে পারলে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবে। এ জাহাজে তার স্থান হবে ভালভাবে। কারণ মকবুল হেড নাবিক, তার উপর নির্ভর করে অন্যান্য নাবিকের ভাগ্য।

বনহুর মকবুলের ক্যাবিনে প্রবেশ করে হেসে বললো—চাচা চলো, কাজ শুরু করবে কখন?

মকবুল আলমকে দেখে যেন চমকে উঠলো, কেমন যেন ভয়বিহ্বল ঘোলাটি দৃষ্টি নিয়ে তাকালো তার দিকে। কি যেন বলতে চায় কিন্তু পারছে না।

বনহুর আরও সরে এলো, বললো—চাচা, তোমার কি হয়েছে? তোমাকে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছে! ব্যাপার কি চাচা?

অধর দংশন করতে লাগলো মকবুল। বার বার তাকাচ্ছে সে আলমের মুখে। সমস্ত দেহ তার ঘেমে উঠেছে উত্তেজনায়।

বনহুর মকবুলের কাঁধে হাত রাখলো—তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো চাচা।

অসুস্থ....না না, অসুস্থ আমি নই বাবা, অসুস্থ আমি হইনি। মকবুল ক্যাবিনের দরজার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে দেখে নেয়। তারপর বনহুরের কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলতে যায়।

কিন্তু মকবুল কিছু বলবার পূর্বেই সুতীক্ষ্ণ একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হয় তার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে পড়ে যায় মকবুল ক্যাবিনের মেঝেতে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠে মেঝেটা।

বনহুর মকবুলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ছুটে যায়, বাইরে কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। ফিরে আসে বনহুর, দ্রুত হস্তে মকবুলের পিঠ থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—চাচা, বলো কে তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো? যার নাম বলতে তুমি বিলম্ব করছিলে? বলো—বলো চাচা?

মকবুল অতিকষ্টে শুধু দুটি শব্দ উচ্চারণ করলো...... আলম...... আমাকে...... নয়.....তোমাকে......হত্যা ক-র-তে—কথা শেষ করতে পারে না সে, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে চোখ তুলে তাকায় বনহুর, দেখতে পায় নাসের ও আর ও দু'জন দাঁড়িয়ে দরজার উপরে!

নাসের সরে আসে; ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে—কেন তুমি ওকে হত্যা করলে আলম, বলো?

বনহুর মকবুলের মৃতদেহের পাশ থেকে উঠে দাঁড়ায়, সরে আসে নাসেরের সম্মুখে, গম্ভীর কণ্ঠে বলে সে—আমি ওকে হত্যা করিনি।

হাঃ হাঃ হাঃ এখনও তোমার হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা বিরাজ করছে, আর তুমি বলছো ওকে হত্যা করোনি?

না।

কিন্তু কি প্রমাণ আছে যে তুমি ওকে হত্যা করোনি?

আমি নিজেই প্রমাণ। আমি নিজে জানি আমি হত্যা করিনি।

আমরা জানি, তুমিই মকবুলকে হত্যা করেছো, কারণ তুমি হেড নাবিক হতে চাও।

মিথ্যা কথা, আমি হেড নাবিক হতে চাই না। ছোরাখানা দূরে নিক্ষেপ করলো বনহুর।

নাসের তার সঙ্গীদ্বয়কে ইংগিত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে শম্ভু আর জম্বু জাপটে ধরলো বনহুরকে। মনে করলো ওরা এই সময় জাহাজে মালিকের দল কেউ নেই, কাজেই আলমকেও হত্যা করে

ফেলবে এবং মালিককে জানাবে—মকবুল আর আলম মারামারি করে নিহত হয়েছে।

শম্ভু আর জম্বু নাবিক আলমকে জাপটে ধরতেই এক ঝটকায় সে ওদের দু'জনাকে মেঝেতে ফেলে দিলো।

বিস্ময়ে দু'চোখ গোলাকার হলো নাসেরের। সে জানে, শম্ভু আর জম্বুর মত বীর শক্তিশালী লোক তাদের জাহাজে আর নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে আলম ওদের দু'জনাকে এক সঙ্গে ভূতলশায়ী করলো তখন নাসের শুধু অবাক হলো না, মনে মনে ভীতও হলো।

ততক্ষণে শম্ভু আর জম্বু উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়া দিলো। নাসের উবু হয়ে যেমন ছোরাখানা হাতে উঠিয়ে নিতে যাবে, অমনি বনহুর ওর হাতের উপর পা দিয়ে চেপে ধরলো—খবরদার!

নাসের ছোরা ত্যাগ করতেই বনহুর পা সরিয়ে নিলো।

আর এক মুহূর্ত ওরা দাঁড়ালো না, বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

বনহুর মকবুলের মৃত্যুমলিন মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখলো—বুঝতে পারলো, এর হত্যার পিছনে রয়েছে গভীর এক রহস্য। সে আর বিলম্ব না করে নেমে গেলো মেরুন্দা বন্দরে। আবু সাঈদ ও নীহার তখন ঘুরে ফিরে সব দেখছিলেন। হঠাৎ তারা আলমকে উত্তেজিত অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলেন বললেন আবু সাঈদ—ব্যাপার কি আলম?

স্যার, আপনি জাহাজে আসুন, জরুরী প্রয়োজন আছে।

আবু সাঈদ, নীহার এবং অন্যান্য পর্যটক সবাই ব্যস্তভাবে জাহাজে ফিরে এলেন।

বনহুর হেড নাবিকের মৃত্যু সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শোনালেন। শুধু নাসের ও তার অনুচরদ্বয়ের আক্রমণের কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখে দিলো সে।

আবু সাঈদ প্রবীণ নাবিক মকবুলের নির্মম মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কে, কেন তাকে হত্যা করলো—ভেবে অস্থির হলেন তিনি। হত্যাকারী যে তার জাহাজেই আছে তা সহজেই বুঝতে পারলেন। কিন্তু আবু সাঈদ বেশি ঘাবড়ালেন না, কারণ মেরুন্দা বন্দরের পুলিশ মহল এ সংবাদ অবগত হলে তাদের যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কাজেই ঘটনাটা চেপে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন।

তাদের জাহাজের নাবিক মকবুলের মৃত্যু স্বাভাবিক বলে তিনি ঘোষণা করলেন এবং তাকে মেরুন্দায় কবরস্থ করবার জন্য আদেশ দিলেন।

যে অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে 'পর্যটন' মেরুন্দায় ভিড়েছিলো সে আনন্দ আর কারো মনে রইলো না। পর্যটনের যাত্রিগণের মনে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলো। কে হত্যা করলো বৃদ্ধ নিরীহ নাবিক বেচারীকে?

বিশেষ করে নীহার আরও ভীত হয়ে পড়েলো। মকবুলের মৃত্যুদৃশ্য তাকে একেবারে ভয়-বিহ্বল করে তুলেছে।

মেরুন্দায় কয়েকদিন থাকবেন মনে করেছিলেন আবু সাঈদ, কিন্তু তা আর হলো না—একদিন পরেই মেরুন্দা ত্যাগ করতে হলো তাঁকে। উদ্দেশ্য, এখন ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের দিকে যাবেন, কিন্তু এতোবড় একটা রহস্যজনক হত্যাকান্ডের পর পর্যটক দলের মধ্যে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যতার ছাপ পরিস্ফুটিত হয়ে উঠলো। কিন্তু আবু সাঈদের মুখের উপর কেউ কোনো উক্তি উচ্চারণে সক্ষম হলো না। প্রবীণ পর্যটক আবু সাঈদ অবশ্য এ ব্যাপারে নিত্যন্ত মুষড়ে পড়লেও তার ইচ্ছা অটুট রাখবেন। আবু সাঈদ ছিলেন যেমন সরল-স্বাভাবিক তেমনি ছিলেন এক জেদী মানুষ। শত বাধা-বিপত্তিতেও তিনি ঘাবড়াতেন না। তিনি যা মনে করতেন সে কাজ সমাধা না করে স্বস্তি ছিলো না তাঁর।

আবু, সাঈদ জানতে পেরেছিলেন—ইরুইয়ার অদূরে একটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়েছে—অদ্ভুত এক দ্বীপ। চারিধারে সাগর আর মাঝখানে কচ্ছপ পৃষ্ঠের ন্যায় একটি সুউচ্চ মৃত্তিকাস্তর। প্রায় পাঁচশত মাইলব্যাপী এই অদ্ভুত দ্বীপটি হঠাৎ একদিন সাগরবক্ষে মাথা উঁচু করে জেগে উঠেছে। একটি মালবাহী জাহাজই প্রথম আবিষ্কার করে এই দ্বীপটি। এখানে আরও বহু জাহাজ যাওয়া-আসা করেছে কিন্তু কেউ কোনো দিন এখানে কোনো দ্বীপ দেখেনি। যে মালবাহী জাহাজ প্রথম এ দ্বীপ আবিষ্কার করেছে তার ক্যাপ্টেনের নাম হলো 'ফৌজিন্দিয়ার' তাই তার নাম অনুসারে এ দ্বীপের নামকরণ হয়েছে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ।

শুধু তাই নয়, এ দ্বীপ সম্বন্ধে আরও অদ্ভুত একটি উক্তি তিনি জানতে পেরেছেন, এ দ্বীপের নিকটবর্তী জলপথ দিয়ে কোনো জাহাজে চলাফেরা করতে গেলে তারা গভীর রাতে লক্ষ্য করেছে—দ্বীপের উপরে বেশ কিছুসংখ্যক আলোক প্রদীপ ক্ষিপ্রগতিতে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। কিন্তু কোনো জন প্রাণী যদি সন্ধান নিতে ঐ দ্বীপে অবতরণ করে তাহলে কিছুই তারা দেখতে পায় না, এমনকি কোনোরকম আলোকরশ্মিও নজরে পড়ে না। আরও একটি বিস্ময়কর ঘটনা কর্ণগোচর হয়েছে আবু সাঈদের—সে হলো আশ্চর্য একটি শব্দ। দ্বীপ হতে মাঝে মাঝে একটা শব্দ শুনা যায়, যেন কোনো ইঞ্জিনের হুইসেলের তীব্র শব্দ। অনেক বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারক দল নানাভাবে সন্ধান নিয়ে দেখেছেন কিন্তু আজও কেউ এসব ব্যাপারে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

আবু সাঈদের বন্ধুবর রব্বানী রিজভী নিজেও একজন অভিজ্ঞ প্রবীন বৈজ্ঞানিক। তিনিও এ দ্বীপ সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে এ দ্বীপে গিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। গভীর রাতে আলোকরশ্মি এবং সেই বিস্ময়কর শব্দ সম্বন্ধে কোনোরকম রহস্য উদ্‌ঘাটনে সক্ষম হননি।

এই ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ সম্বন্ধে নানাজন এখন নানারকম বাক্য উচ্চারণ করে চলেছে। নানা জনের নানা মতবাদ—স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত কারো স্বস্তি নেই। বিশেষ করে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ব্যতিব্যস্তভাবে সন্ধান চালিয়ে চলেছেন কিন্তু আজও কোনো কিছু আবিষ্কারে সক্ষম হননি।

রহস্যময় দ্বীপটি মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছে এক গভীর সমস্যাময় প্রশ্ন। এক উন্মত্ত বাসনা আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে প্রতিটি বিশেষজ্ঞ মহাত্মনকে।

আবু সাঈদ তাঁদেরই একজন।

মকবুল মিয়ার নির্মম মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করলেও তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল রইল্লেন। তিনি মকবুলের মৃত্যু সম্বন্ধে সকলকে শান্ত হবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

❑

জাহাজ চলেছে বটে কিন্তু হেড নাবিকের স্থানে এখনও কাউকে মঞ্জুর করা হয়নি। উপস্থিত হেড নাবিকের কাজ চালাচ্ছে নাবিক আলম—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বনহুর মকবুলের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেছে এবং তার মৃত্যু-যন্ত্রণা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে। মকবুলের মৃত্যুর কারণ যে কি, সঠিক না জানতে পারলেও তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যে মুখোভাব এবং তার অস্থিরতা লক্ষ্য করেছে তা অত্যন্ত রহস্যময়। বনহুর কিছুটা যে একেবারে বুঝতে পারেনি তা নয়। মকবুলের মৃত্যুকালের শেষ উক্তিগুলোর প্রতিটা শব্দ তার মনে গাঁথা হয়ে আছে....আলম....আমাকে...নয় তোমাকে হত্যা কর—তে...কথা শেষ করতে পারেনি বেচারী। মকবুল তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, সেই কারণেই ওকে হত্যা করা হয়েছে এবং কে-বা কারা হত্যা করেছে তাও সে জানে, যদিও ছোরা নিক্ষেপকারী তার দৃষ্টির আড়ালে ছিলো।

বনহুর শুধু অসীম শক্তির অধিকারীই নয়, তার সূক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমানকেও হার মানতে হয়। বনহুর এতো জেনেও কেন নীরব রইলো? পারতো না কি সে সব কথা আবু সাঈদকে খুলে বলতে, কিন্তু বনহুর এ রহস্য উদঘাটন করতে ইচ্ছুক নয়। সে নিজ হস্তে প্রবীণ নাবিক মকবুলের হত্যাকারীকে সায়েস্তা করতে চায়। কাজেই বনহুর নীরব থেকে নিজ কাজ করে চললো

❑

বনহুর যখন এতো জেনে এবং দেখেও নাসের সম্বন্ধে বাকহীন রইলো তখন শৃগালের মত সেজে নাসের আবার নতুন এক দূরভিসন্ধি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলো।

নীহার এবং আবু সাঈদের মনে সন্দেহ জাগানোর জন্য একদিন নাসের তার এক অনুচরকে নিয়ে হাজির হলো ক্যাপ্টেনের ক্যাবিনে। ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ এবং নীহার জাহাজের মধ্যে পাশা-পাশি দুখানা সোফায় বসে চা পান করছিলেন। নাসের ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই আবু সাঈদ তাকে আপ্যায়ন করলেন—এসো এসো, নাসের বসো!

নাসের আসন গ্রহণ করলো।

তার সঙ্গী লোকটিকে ক্যাবিনের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে এসেছে সে, কাজেই লোকটি দাঁড়িয়ে রইলো দরজার ওদিকে।

আবু সাঈদের মুখমন্ডল ভাবগম্ভীর থমথমে লাগছে।

নীহার ক্যাবিনের জানালা দিয়ে তাকালো বাইরে সীমাহীন আকাশের দিকে। নাসেরকে সে যেন দেখেও দেখলো না। সম্মুখস্থ টেবিল থেকে চানাচুর নিয়ে দু'একটা ফেলতে লাগলো মুখগহ্বরে। চিবুতে লাগলো যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে।

জাহাজের একটানা ঝক্ঝক্ শব্দের সঙ্গে জলতরঙ্গের কলকল খলখল শব্দ মিলে অদ্ভুত এক সুরের সৃষ্টি হচ্ছিলো। আবু সাঈদ সিগারেটটা পান করছিলেন; একরাশ ধুম্রকুন্ডলীর ভিতর দিয়ে তাকালেন তিনি নাসেরের মুখে—নাসের, আমি বড় দুশ্চিন্তিত।

অনুগত ছাত্রের মত হাতের মধ্যে হাত কচলায় নাসের, কিছু বলতে চায় যেন, কিন্তু বলতে গলায় আটকে যাচ্ছে—অবশ্য এটা নাসেরের অহেতুক একটা অভিনয়ের ঢং মাত্র। ভ্রূ জোড়া উঁচু করে এবার দেখে নিলো সে নীহারের মুখখানা, তারপর বললো—দুশ্চিন্তার কারণই বটে স্যার। সমস্ত জাহাজময় একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।

হ্যাঁ, এই হত্যাকান্ড শুধু সমস্ত জাহাজেই আতঙ্ক সৃষ্টি করেনি নাসের, আমাকে কতখানি যে দমিয়ে দিয়েছে তা কি বলবো! আবু সাঈদের ললাটের রেখাগুলি যেন দড়ির মত শক্ত হয়ে উঠে। গভীর অশান্তির ছায়া প্রকাশ পায় তার চোখেমুখে।

নাসের মাথা নীচু করে, আবু সাঈদের অন্তরের বেদনার ছাপ যেন তার মনেও আঁচড় কেটেছে এমন একটা ভাব মুখে টেনে ঢোক গিলে বলে নাসের—স্যার, এতোবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলো যার জন্য আমাদের জাহাজের প্রতিটি যাত্রী ভীত আতঙ্কিত। অথচ সেই হত্যাকান্ডের অধিনায়ক নিশ্চিন্ত মনে এ জাহাজেই বিচরণ করে ফিরছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে বললেন আবু সাঈদ—হাঁ, সে এ জাহাজেই আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্যার, এতোবড় একটা নৃশংস হত্যা করেও সে আমাদের জাহাজে আশ্রয় নিয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ করে চলেছে, অথচ তাকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত হচ্ছে না।

নাসের কথাটা এমনভাবে শেষ করলো যেন সে হত্যাকারীর সঠিক সন্ধান জানে।

আবু সাঈদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তুলে ধরলেন নাসেরের দিকে। তারপর অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা সম্মুখস্থ এ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে সোজা হয়ে বসে বললেন—মকবুলের হত্যাকারীর সঠিক সন্ধান এখনও উদঘাটন হয়নি, কাজেই আমি কি করতে পারি বলো?

নাসেরের মুখমন্ডলে একটা প্রতিহিংসার ছায়াপাত হলো, কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখ, বললো সে—ঐ দুষ্ট হত্যাকারী যদিও সকলের দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু আমার চোখে সে ধুলো দিতে পারেনি।

আচমকা বোমা বিস্ফোরণের শব্দে মানুষ যেমন চমকে উঠে তেমনি নাসেরের কথাটা তার গলা থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবু সাইদ এবং নীহার চমকে ফিরে তাকালো।

বিস্মিত নীহারের সমস্ত দেহের রক্ত যেন থেমে গেছে শিরায় শিরায়।

আবু সাঈদ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন—মকবুলের হত্যাকারী কে, তুমি তা জানো?

নাসেরের মুখে একটা বিকৃত হাসির ঢেউ খেলে গেলো বললো নাসের—স্যার, নিজের চোখে দেখা, কাজেই বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

স্তব্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে আছেন আবু সাঈদ আর নীহার ওর ভাবকঠিন মুখখানার প্রতি। এই মুহূর্তে জানতে পারবে তারা মকবুলের হত্যাকারীর

নাম। কি ভয়ঙ্কর নরপিশাচ সে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ নাবিকের বুকে ছোরা বিদ্ধ করেছিলো।

বললো নাসের—যাকে আমরা সদ্য মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করে আমাদের জাহাজে আশ্রয় দিয়েছি......একটু থেমে বললো আবার—সেই নরাধম অকৃতজ্ঞ আলম।

ক্যাবিনে বাজ পড়লেও এতোটা স্তম্ভিত হতেন না আবু সাঈদ ও নীহার। মুহূর্তে মুখ কালো হয়ে উঠলো আবু সাঈদের, বললেন—নাবিক আলম মকবুলের হত্যাকারী—বলো কি!

হাঁ। দৃঢ় কণ্ঠে বলতে চাইলো নাসের কিন্তু গলাটা কেমন ফ্যাসফ্যাসে শোনালো।

মিথ্যা কথা! চীৎকার করে বললো নীহার। তার সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে একটা অবিশ্বাসের ছাপ।

নাসেরের মিথ্যা বলা অভ্যাস—তবু সেদিনের আলমের যে দুর্দান্ত রূপ সে লক্ষ্য করছিলো, তার নামে এতোবড় একটা জলজ্যান্ত মিথ্যা বলতে একটু ভড়কে গেলো বইকি, তবু বললো—শুধু আমিই নই, শম্ভু নিজেও দেখেছে।

শম্ভু! আমাদের লাঠিয়াল সর্দার শম্ভু?

হাঁ। জবাব দিলো নাসের।

আবু সাঈদ তার জাহাজে শুধু পর্যটকগণকেই সাদরে গ্রহণ করেননি, তাঁর জাহাজে সবরকম ব্যক্তিই তিনি গ্রহণ করেছেন। বাবুর্চি থেকে লাঠিয়াল, তীরন্দাজ, বন্দুকধারী, সবরকম লোক আছে। কারণ তাঁকে পর্যটক হিসেবে নানা দেশে নানা স্থানে অবতরণ করতে হয়। কখন কোন্ বিপদ আসে বোঝা মুস্কিল, এজন্যই তিনি সতর্কতার সঙ্গে সাবধানতা রক্ষা করে চলেন। শুধু শম্ভুই নয়, আরও বেশ কতকগুলো শক্তিশালী লোককে তিনি মোটা বেতন দিয়ে নিজেদের রক্ষাকারী হিসাবে জাহাজে রেখেছেন। এরা শুধু বসে বসে মনিবের খাদ্য গলধঃকরণ করবে আর মাস শেষে বেতনের টাকা পকেটস্থ করবে। কাজ বিপদ কালে, অন্যসময় নয়।

অবশ্য আবু সাঈদ পূর্বে এমন সাবধান ছিলেন না, তিনি বিনা অস্ত্রেও দেশ পর্যটন করেছেন কতবার। কিন্তু একবার তিনি একটা অদ্ভুত দেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, যেখানে আবু সাঈদ পর্যটক হিসাবে সমাদর না পেয়ে পেয়েছিলেন নানারকম বাধা-বিপত্তি। এমনকি সে দেশের বাসিন্দাগণ ভীষণভাবে আক্রমণ করে আহত করেছিলেনা তাঁকে এবং তার কতকগুলো সঙ্গী-সাথীকে। দু'জন নিহতও হয়েছিলো সেবার। তাছাড়া আরও কতবার যে কত বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে আবু সাঈদকে, তার ইয়ত্তা নেই।

কাজেই আবু সাঈদ আত্মরক্ষার জন্য সবরকম জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশ কিছুসংখ্যক বলিষ্ঠ লোক রাখতেন।

শম্ভু আবু সাঈদেরই লাঠিয়াল বিভাগের একজন সর্দার।

আবু সাঈদ বললেন—শম্ভুও দেখেছে?

বাইরেই আছে সে, আমি ডাকছি। উচ্চকণ্ঠে ডাকলো নাসের—শম্ভু!

আজ্ঞে? জবাব এলো ক্যাবিনের দরজার ও পাশ থেকে।

এসো। বললো নাসের।

ভীমকায় লাঠিয়াল সর্দার শম্ভু প্রবেশ করলো নতমুখে ক্যাবিনের মধ্যে। লম্বা একটা ছালাম ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

যেন সে আদালতের বিপক্ষপাতী সাক্ষী।

আবু সাঈদ পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন। তিনি নাসেরের মুখে আলম হত্যাকারী কথাটা শুনে উঠে পড়েছিলেন—আসন গ্রহণ করে বললেন—শম্ভু মকবুলের হত্যা সম্বন্ধে তুমি কিছু জানো?

অপরাধীর দৃষ্টি নিয়ে তাকায় শম্ভু আবু সাঈদের মুখে, তারপর দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে—হাঁ, আমি দেখছি হুজুর।

দেখেছো! আলম.....নাবিক আলম মকবুলকে হত্যা করেছে, তুমি দেখেছো?

পিতার সঙ্গে সঙ্গে নীহারের দৃষ্টিও স্থির হয় শম্ভুর মুখের উপর। নীহারের নিশ্বাস দ্রুত বইছে। যা শুনছে সম্পূর্ণ যেন অস্বাভাবিক এবং মিথ্যা। নাবিক আলম কেন হত্যা করবে বৃদ্ধ নাবিক মকবুলকে—ভেবে পায় না সে। বুকের মধ্যে একটা তীব্র আলোড়ন শুরু হয়েছে তার।

শম্ভু একবার নাসেরের মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো, চোখ মিলালো দু'জনা, তারপর বললো সে হুজুর, আমি নিজের চোখে.....

কঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো নীহার—খবরদার, মিথ্যা কথা বলো না।

মিথ্যা—না না, মিথ্যা বলবো না মেমসাহেব। যা দেখেছি—যা দেখেছি—আমি ঠিক তাই বলবো।

কি দেখেছো—বলো? বললেন আবু সাঈদ।

শম্ভু তার বক্তব্য পেশ করবার পূর্বে একবার ক্যাবিনের দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। যার সম্বন্ধে বলতে যাচ্ছে, সে যদি হঠাৎ এসে পড়ে তাহলে বিভ্রাট ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সেদিন শম্ভু তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার মুখের কাছে হাত নিয়ে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলো, তারপর বললো—আলম আর মকবুল মিয়ার মধ্যে কি যেমন কথা নিয়ে তর্ক হচ্ছিলো। হঠাৎ একটা গোঙ্গানির শব্দ শুনতে পেয়ে আমরা ছুটে যাই....আবার একবার নাসেরের সঙ্গে দৃষ্টি

বিনিময় হলো শম্ভুর কিন্তু কণ্ঠ বন্ধ হয় না, বলেই চলে সে—আমরা ছুটে গিয়ে দেখতে পাই—মকবুলের দেহটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে, ওর বুক থেকে রক্ত ঝরছে—আলমের হাতে একখানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা.....

শম্ভু যখন কথাগুলো বলছিলো তখন কণ্ঠ যেন কেমন আটকে আসছিলো তার। মনে মনে নাসের ওর কথায় রাগান্বিত হচ্ছিলো, শম্ভুর কথা শেষ না হতেই বললো নাসের—ওর পূর্বেই আমি ক্যাবিনে প্রবেশ করেছিলাম। স্যার, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আলম মকবুলের বুক থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিচ্ছে। নাবিক আলমই ওকে হত্যা করেছে স্যার।

নীহার তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো—আব্বা, নাসের সাহেব যা বলছেন— সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ মকবুলের বুকে ছোরার আঘাত ছিলো না, আঘাত ছিলো পিঠে অথচ উনি বলছেন মকবুলের বুক থেকে নাবিক আলমকে তিনি ছোরা তুলে নিতে দেখেছেন।

নীহারের কথায় একটু ভড়কে যায় নাসের, দ্রুত বলে উঠে—সরি, বলতে একটু ভুল হয়েছে, মানে আমি ঠিক লক্ষ্য করতে পারিনি, মকবুলের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে আমি জ্ঞানশূন্যের মত দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। নীহার পুনরায় বলে উঠলো—এমনও তো হতে পারে কেউ মকবুলকে ছোরাবিদ্ধ করেছিলো, আলম তাকে বাঁচানোর জন্য ছোরাখানা তার দেহ থেকে টেনে তুলে ফেলছে—সেই মুহূর্তে আপনারা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

নাসেরের সঙ্গে পুনরায় দৃষ্টি বিনিময় হলো শম্ভুর।

বললো নাসের—এ জাহাজে মকবুল মিয়ার সঙ্গে কারো কোনোরকম দুশমনি ছিলো না। সরল স্বাভাবিক নাবিক ছিলো সে। জাহাজের ছোট বড় সবাই তাকে ভালবাসতো। স্যার, আপনি বলুন, অন্য কেউ কেন তাকে হত্যা করবে?

বললেন আবু সাঈদ—আর নাবিক আলমই বা তাকে হত্যা করতে যাবে কেন? তার সঙ্গে কোনোরকম প্রতিহিংসা ছিলো বলে মনে হয় না আমার।

স্যার, আপনি একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারখানা।

তার মানে? বললেন আবু সাঈদ।

ব্যাপারখানা অত্যন্ত স্বাভাবিক স্যার, শুধু আমি আর শম্ভুই নয়, জাহাজের অনেকেই জানে—নাবিক আলম এ জাহাজে আশ্রয় পাবার পর থেকে তার মনোভাব, সে হেড নাবিকের পদে বহাল হয় এবং সেই কারণেই দিবারাত্র অবিশ্রান্ত খাটুনি করে সকলের মন জয় করে নেবার চেষ্টা করে—বিশেষ করে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিলো তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সে শেষ

অবধি বুঝতে পেরেছিলো, মকবুল মিয়া থাকা পর্যন্ত হেড নাবিক পদে বহাল হবার তার কোনো আশা নেই। কাজেই মকবুল মিয়াকে সরাতে না পারলে.....

নাসের সাহেব, আপনি যা বলছেন সে ধরনের লোক নয় আলম। সে কখনো হেড নাবিক হবার জন্য লালায়িত ছিলো না। নীহার রুদ্ধ কণ্ঠে কথা কয়টা বললো।

নাসের নীহারের কথায় ভিতরে ভিতরে ভীষণ রাগান্বিত হলেও নিজেকে সংযত রেখে শান্ত কণ্ঠে বললো—তার যদি হেড নাবিক হবার সাধই না থাকতো সে নিজে যেচে মকবুলের কাজ করতে এগিয়ে যেতো না। এতেই বোঝা যায়, সে লালায়িত ছিলো কিনা।

আবু সাঈদ বললেন এবার—নাসের তুমি ভুল বলছো। কারণ আলমকে আমিই সেধে তবে হেড নাবিকের কাজ দিয়েছি, সে কখনো হেড নাবিক হতে চায়নি বা সে জন্য কোনো বেশি পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেও রাজী নয়।

নাসের ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসলো, বললো আবার—বেশ, যা ভাল মনে করেন সেই ভালো। পুনরায় যেদিন আবার মহা অঘটন ঘটবে তখন দেখবেন আমার কথা মনে পড়বে।

আবু সাঈদ বললেন—তোমরা এতগুলো আমার হিতৈষী আপন জন থাকতে একা আলমের সাধ্য কি সে কোনো অঘটন ঘটায়। তোমরা এখন যেতে পারো নাসের। 'পর্যটন' যতদিন না স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছে ততদিন আমাকে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতেই হবে।

এরপর নাসের আর শম্ভু দাঁড়াতে পারে না, বেরিয়ে যায় ধূর্ত শিয়ালের মত লেজ গুটিয়ে।

নীহার ওদের চলে যাওয়ার পর পিতাকে লক্ষ্য করে বলে—আব্বা, ওদের কথা তুমি কখনো বিশ্বাস করো না। বেচারী আলম সত্য ও মহৎ ব্যক্তি।

হ্যাঁ মা, ওকে আমার ভাল লাগে, আহা বড় গরীব বেচারী! যেমন সরল তেমনি অমায়িক। গরীবের ঘরে জন্মালেও চেহারাটা যেমন সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তানের মত।

পিতার মুখে নাবিক আলমের প্রশংসা বাণী যেন নীহারের কানে মধুবর্ষণ করে। মাথা নীচু করে নিজের মনের দুর্বলতা গোপন করার চেষ্টা করে সে।

❑

দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ইঞ্জিনে কাটানোর পর ছুটি পেয়ে বেরিয়ে এলো বনহুর। সমস্ত দেহ তেল-কালি মাখা, হাতে একটি কালি মাখা রুমাল।

ঘর্মাক্ত দেহটা জুড়িয়ে নেবার জন্য ডেকের রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ালো সে। রেলিং-এ ভর দিয়ে তাকিয়ে রইলো ফেনিল ঘোলাটে জলরাশির দিকে।

সাগরের মুক্ত বাতাসে অল্পক্ষণেই ক্লান্তি দূর হলো কিন্তু তখন বনহুরের মনের আকাশ একটা দুর্দমনীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। নূরীর অন্তর্ধান নিয়ে গভীরভাবে ভেবে চলেছে সে। নূরীর আশা হয়তো এবার তাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করতে হবে। আর কোনোদিন ওকে পাবে বলে মনে হয় না। সাগরের পানিতে যেন ওর করুণ মুখখানাই ভাসছে। কলকল ছলছল ধ্বনির মধ্যে সে যেন শুনতে পাচ্ছে নূরীর আকুল কণ্ঠের ক্রন্দনের শব্দ। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

আলম, তুমি কি ভাবছো?

একি, মেম সাহেব আপনি?

নীহার বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়, বলে—হাঁ, কি ভাবছিলে আলম?

বনহুর হাতের পিঠে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সোজা হয়ে বলে—গত জীবনের কথা স্মরণ হচ্ছিলো তাই.....

তাই খুব দুঃখ হচ্ছিলো মনে বুঝি?

বনহুর নিশ্চুপ থাকে।

নীহার বলে আবার—সমস্ত দিন ইঞ্জিনের গনগনে বয়লারের পাশে কাটাও—খুব কষ্ট হয়, তাই না?

না মেম সাহেব।

আলম, তুমি না বললেও আমি বুঝি—সব বুঝি। আলম?

বলুন মেম সাহেব।

তুমি আর এতো কষ্ট করতে পারবে না। আব্বাকে বলে আমি তোমার জন্য কাজ জুটিয়ে দেবো। মাইনেও বাড়িয়ে দেবো, বুঝলে?

কিন্তু আমি তো নাবিকের কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ জানি না। মেম সাহেব, আপনি আমার জন্য কিছু ভাববেন না। ইঞ্জিনের কাজে আমার কোনো কষ্ট হয় না।

কি যে বলো! এইতো গোটাদিন পর সবে ছুটি পেলে। চেয়ে দেখো দেখি কি অবস্থা হয়েছে তোমার দেহটার।

বনহুর নিজের দেহটার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বলে—গরীবের আবার দেহ!

নীহার এতোবেশী সরে এসেছে যে, তার দেহের একটি মিষ্ট গন্ধ বনহুরের নাসিকায় প্রবেশ করছিলো। একটা উগ্র মিষ্ট গন্ধ, চুলগুলো

বাতাসে উড়ছে ওর। আঁচলখানা বার বার সরে যাচ্ছিলো বুকের উপর হতে। বনহুর বললো—চলুন মেম সাহেব, আপনাকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

একটু অপেক্ষা করো আলম, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কথা! আমার সঙ্গে?

হাঁ। তোমার সঙ্গে। আলম, জানো এ জাহাজে তোমার কয়েকজন শত্রু আছে? তারা তোমাকে সর্বক্ষণ বিপদে ফেলার জন্য উন্মুখ।

আমি তো কোনো অপরাধ করিনি?

শয়তানদের কাছে কোনো অপরাধ করতে হয় না আলম, তারা পরের ভালো দেখতে পারে না। তোমার গুণটাই হলো ওদের ঈর্ষার কারণ। আব্বা তোমার কাজ অনেক পছন্দ কারেন তাই......

হাসে বনহুর।

নীহার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। বনহুর ফিরে তাকায়, ওর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি নত করে নেয় নীহার। বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্ভেদী যেন সে চোখ দু'টি। নীহার কোনো কথা বলতে পারে না সহসা।

বনহুর নীহারের মনের দুর্বলতা উপলব্ধি করে, বুঝতে পারে—নীহার তার মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে তাকে—কিন্তু এ তার কত বড় ভুল জানে না! বনহুর নীহারের মুখে স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখতে চায় সে, ওর মায়ামমতায় ভরা সুন্দর অন্তরটাকে। যে অন্তর ফুলের চেয়েও পবিত্র, জ্যোছনার আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ, শিশিরের চেয়েও সচ্ছ।

বনহুর নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে নীহারের সুন্দর মুখমন্ডলের দিকে।

নতমুখে দাঁড়িয়েছিলো নীহার; চোখ তুললো—পুনরায় বনহুরের সঙ্গে চোখাচুখি হলো। নীহারের মনের মধ্যে একটা আনন্দের অনুভূতি বিদ্যুতের মত খেলে গেলো। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো ওর গন্ড দু'টি। আর দাঁড়াতে পারলো না সে বনহুরের সম্মুখে, একটু হেসে দ্রুত চলে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরলো, ঠিক সেই সময় নাসেরের সঙ্গে শম্ভু, জম্বু আর জলিল এসে দাঁড়ালো। লাঠিয়ালদের আর একজন হলো জলিল।

সেদিন শম্ভু আর জম্বুর মুখে তাদের নাকানি চুবানির কথা শুনে জলিল পাহলওয়ান ক্ষেপে গেলো ভীষণভাবে। একটা সামান্য নাবিক বেটার কাছে তারা এতো বড় বড় শক্তিশালী জোয়ান লোক হয়ে হুমড়ি খেলো! ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা! জলিল স্বয়ং সুযোগ বুঝে তাদের সঙ্গে এসেছে, আজ সে একাই দেখে নেবে নাবিক আলমকে।

শম্ভু আর জম্বুর চেয়ে জলিলের দেহ আরও বলিষ্ঠ। দেহের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অংশের মাংশপেশীগুলো যেন লৌহপিন্ডের মত শক্ত আর দলা হয়ে রয়েছে। খাড়াখাড়া এক জোড়া গোঁফ ক্ষুদে গোল গোল লাল চোখ! আকারে লম্বা নয়, বেটে গোছের চেহারা।

নাসের সম্মুখে আর ওরা তিনজন বনহুরের তিন পাশে দাঁড়ালো। এক একজনের চোখ দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। হিংস্র জন্তু শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়বার পূর্বে যেমন ভীষণ আকার ধারণ করে তেমনি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে শম্ভু, জম্বু আর জলিল এসে দাঁড়ালো।

বনহুর সিগারেটে সবেমাত্র অগ্নিসংযোগ করেছে, মুখের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো ওদের চারজনার মুখে, ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো রেলিং এ। সিগারেট থেকে একমুখ ধুয়া টেনে নিয়ে সম্মুখে ছুঁড়ে দিলো নিশ্চিন্ত মনে। সিংহ যেমন ক্রুদ্ধ শিয়ালের দিকে অবহেলা করে তাকিয়ে দেখে তেমনি শান্ত ভাব নিয়ে তাকালো।

বনহুরের তাচ্ছিল্য ভাব দেখে নাসের এবং তার সঙ্গীদের দেহ জ্বালা করে উঠলো। ক্রমান্বয়ে ফুলে উঠতে লাগলো শম্ভু, জম্বু আর জলিলের মাংসপেশীগুলো।

জাহাজের এদিকটা সম্পূর্ণ নির্জন, আশেপাশে বা অনতিদূরে কেউ নেই। বনহুর কাজ শেষে প্রায়ই এই পাশে এসে দাঁড়াতো নিরালায় গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ পেতো সে।

আজও তাই প্রতিদিনের মত কাজ শেষ করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ইঞ্জিন কামরায় এখন অন্যজনের ডিউটি আছে তাই সে কতকটা নিশ্চিন্ত। অবশ্য কয়েক ঘন্টা পর আবার তাকে যেতে হবে ইঞ্জিন কামরায়।

বনহুর ওদের দেখেও যেন দেখছে না, এমনি ভাব নিয়ে সিগারেট পান করছিলো।

জলিল হঠাৎ চেপে ধরলো বনহুরের গলার কাছের জামাটা। কর্কশ কণ্ঠে বললো—ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখোনি, বাছাধন!

বনহুর দক্ষিণ হস্তের সিগারেটটা নিক্ষেপ করলো, তারপর সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো জলিলের নাকে।

অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়লো জলিল ডেকের মেঝেতে।

কালবিলম্ব না করে শম্ভু, জম্বু আর নাসের চেপে ধরলো বনহুরকে। জলিলও ততক্ষণে উঠে এসে ধরেছে, বনহুরের মুখমন্ডল লক্ষ্য করে ঘুঁষি মারলো জলিল। বনহুর দক্ষিণ হস্তে জলিলের মুষ্ঠিবন্ধ হাতখানা চেপে ধরলো এটে। বনহুর এবার এক ঝটকায় ওদের তিনজনার কবল থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। তারপর শুরু হলো ভীষণ লড়াই।

এক এক ঘুষিতে এক একজনকে ভূতলশায়ী করতে লাগলো। প্রচন্ড এক লাথি দিয়ে কাবু করে ফেললো জলিলকে। বনহুরের বুটের লাথি যেয়ে লেগে-ছিলো ঠিক জলিলের তলপেটে।

পেট ধরে কুকঁড়ে বসে পড়লো জলিল, একটা গোঙানি বেরিয়ে এলো জলিলের মুখ দিয়ে।

শম্ভু আর জম্বু জলিলের অবস্থা দেখে একটু ভড়কে গেলেও বনহুরের উপর ঠিকভাবেই আক্রমণ চালিয়ে চললো। নাসের হাঁপিয়ে পড়েছে, বনহুরের এক ঘুষি লেগে দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরছে। বুকেও লেগেছে একটা মুষ্ঠাঘাত। পাল্টা আক্রমণের সাহস হচ্ছে না তার! রুমালে দাঁতের রক্ত মুছছে বার বার।

বনহুর বজ্রমুষ্ঠিতে শম্ভু আর জম্বুকে নাজেহাল করে ফেললো, অল্পক্ষণেই লড়াই-এ সাঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছিলো ওরা। জলিল উঠে দাঁড়াতে পারছিলো না তলপেট চেপে ধরে বসেছিলো উবু হয়ে। নাসের তীব্র কটাক্ষে ক্রুদ্ধভাবে বনহুরের দিকে তাকিয়ে জলিলকে ধীরে ধীরে নিয়ে চললো।

বনহুর হেসে উঠলো হা হা করে, তারপর ফিরে গেলো নিজের কেবিনে!

❑

নীহার আর আবু সাঈদ সম্মুখ ডেকে দাড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছিলো। একটু পূর্বে নীহার আলমের নিকট হতে চলে এসেছে। তখনও তার মনে আলমের সুন্দর হাসির প্রতিচ্ছবি মিশে যায়নি। ওর মিষ্টি গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তখনও ভাসছে তার কানে। সন্ধ্যাটা যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে নীহারের কাছে।

পিতা-পুত্রী মিলে নানারকম কথাবার্তা চলছিলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও জমাট বেঁধে উঠেনি, ডেকের বিজলী বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে বটে কিন্তু আলোর দ্যুতি এখনও আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়নি।

উন্মত্ত হাওয়া বইছে।

নীহারের কাছে সব আজ স্বপ্নময় মনে হচ্ছে। উচ্ছল জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আবু সাঈদ চুরুট পান করছিলেন, গায়ে তাঁর একটা পশমী চাদর জড়ানো। গলায় মাফলার, হঠাৎ একটু ঠান্ডা লাগায় শরীরটা আজ ম্যাস ম্যাস করেছে বলেই নীহারের আব্দারে এসব পরিধান করেছেন তিনি। নইলে বড় একটা শরীরের যত্ন নেন না আবু সাঈদ। নীহারের কাছে এজন্য তাকে অনেক সময় অবাধ্য সন্তানের মত অনেক কথা শুনতে হয়। আজ তাই সাবধানে গলায় মাফলারটা বেঁধে শরীরে চাদর জড়িয়ে ডেকে এসে

দাঁড়িয়েছিলেন। অবশ্য নীহার পূর্বেই তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলো।

আবু সাঈদ খামখেয়ালী মানুষ হলেও কন্যা নীহারের কাছে খেয়ালী না হয়ে পারতেন না মেয়ের কাছে তিনি হার মারতেন সব কাজে। এমনকি তার পর্যটক জীবনটাও নীহারের বাধ্যের মধ্যে এসে গিয়েছিলো অনেকখানি।

নীহার যদি বলতো—আব্বা, এবার তোমাকে দক্ষিণ দিকে যেতে হবে, তাই যেতে হতো। যদি বলতো পশ্চিমে—তাই স্বীকার করে নিতেন আবু সাঈদ। তবে নিজের বিবেচনা মত বিদেশ সফরে বের হতেন কিন্তু নীহারের মত না নিয়ে তিনি কোনোদিন পা বাড়াতেন না কোথাও। শুধু তাই নয় যে কোনো কাজে কন্যার পরামর্শ তিনি গ্রহণ করতেন।

আজ ডেকে দাড়িয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা না চললেও পিতা-পুত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝে সচ্ছ কথাবার্তা হচ্ছিলো।

এমন সময় কয়েকটি পদশব্দে ফিরে তাকায় পিতা-পুত্রী!

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় না হওয়ায় স্পষ্ট দেখতে পেলেন আবু সাঈদ এবং নীহার—কেমন যেন ছন্নছাড়ার মত এলোমেলো বেশে এগিয়ে আসছে কয়েকজন, সর্বাগ্রে নাসের, তার পেছনে শম্ভু ও জম্বুর কাঁধে ভর দিয়ে এগুচ্ছে লাঠিয়াল সর্দার জলিল।

প্রথম নজরেই নীহারের মুখ কালো হয়ে উঠলো, ভ্রূকুঁচকে তাকালো সে ওদের দিকে।

আবু সাঈদ বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন, চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ। ক'দিন পূর্বে মকবুলের হত্যাকান্ডে তিনি ভীত না হলেও আতঙ্কিত হয়েছিলেন কিছুটা। আজকাল সামান্যেই তিনি চমকে উঠেন, একটুতেই বেশি ঘাবড়ে যান যেন।

নাসের এবং তার জাহাজের লাঠিয়ালদের আসতে দেখে কয়েক পা এগুলেন সম্মুখে, ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—ব্যাপার কি নাসের?

নাসেরের মুখ শয়তানের মুখের মত কুৎসিত হয়ে উঠেছে যেন। নীহারের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষে তাকিয়ে দৃষ্টি স্থির করলো আবু সাঈদের মুখে বললো—করুণা দিয়ে যার প্রাণরক্ষা করা হয়েছে সেই অকৃতজ্ঞ আলম কি করেছে দেখুন।

অবাক কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেন আবু সাঈদ— আলম!

হাঁ, ছোটলোকদের বেশি লাই দিলে তারা এমনি হয়। তা'ছাড়া গরীব বেচারী মকবুলকে হত্যা করে আরও স্পর্ধা বেড়ে গেছে তার।

নীহার তীব্রকণ্ঠে বলে উঠে—ভূমিকা রেখে সোজা কথা বলুন? আলম কি করেছে?

হাঁ কি করেছে সে? বললেন আবু সাঈদ।

নাসের বিশাল বপু জলিলের কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির স্বরে বললো—স্যার, এতোবড় অমানুষিক ব্যবহার, সে জলিল ভাই এবং আমাদের উপর করেছে তা কি বলবো! জলিল ভাই এবং আমরা তিন জন—শম্ভু জম্বু আর আমি ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, সেই সময় নাবিক আলম এসে দাঁড়ালো আমাদের পাশে। একটা কথা নিয়ে সে আমাদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলো। কিন্তু তর্কে হেরে গিয়ে ক্ষেপে গেলো সে ভীষণভাবে। স্যার, বেচারী জলিল ভাই ও আমাদের সে নাজেহাল করে ছেড়েছে।

খিলখিল করে হেসে উঠে নীহার, তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আলম আপনাদের চারজন বীর পুরুষকে নাজেহাল করে ছেড়েছে? সত্যি তাকে বাহবা দিতে হয়।

নীহারের কথায় লজ্জায়, ক্ষোভে কালো হয়ে উঠে নাসের এবং তার সঙ্গীদের মুখ।

আবু সাঈদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—তোমরা চারজন অথচ সে একা তোমাদের কাবু করে ফেললো—আশ্চর্য! তাঁর মুখমন্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো। একটু থেমে বললেন আবু সাঈদ—অমন ব্যক্তিকে সমাদর করতে হয়। নাসের, আজ থেকে তোমরা আলমকে সমীহ করে চলবে, বুঝলে?

এরপর আর দাঁড়াতে পারলো না ওরা, মুখ চুন করে ফিরে চললো নিজেদের ক্যাবিনের দিকে।

নাসের শম্ভু, জম্বু আর জলিল চলে যেতেই বললেন আবু সাঈদ—সত্যি মা, আলম এ জাহাজে আসায় আমাদের বড় উপকার হয়েছে।

কিন্তু তোমার ঐ গুনধরের দল যে তাকে নানাভাবে অপদস্ত করতে চেষ্টা করছে!

অপদার্থ সব!

এতোদিনে বুঝতে পারলে আব্বা।

চলো মা, আলমকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসি।

❑

বনহুর সবেমাত্র হাত-মুখ পরিস্কার করে ক্যাবিনের খাটিয়ায় দেহটা এলিয়ে দিয়েছে। কেশব তার নিজের খাটিয়ায় বসে আরাম করছিলো—এমন সময় ক্যাবিনে প্রবেশ করেন আবু সাঈদ আর নীহার।

বনহুর ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ ও তার কন্যাকে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো।

কেশবও উঠে পড়লো বনহুরের সঙ্গে।

বনহুর বুঝতে পারলো, নাসের গিয়ে নালিশ জানিয়েছে। সেই কারণে স্বয়ং মালিক এসে হাজির হয়েছেন কৈফিয়ৎ তলব করতে। বনহুর নতদৃষ্টি তুলে তাকালো মালিকের দিকে। নীহারের সঙ্গেও দৃষ্টি বিনিময় হলো একবার।

বনহুর একটা কঠিন বাক্যের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো প্রস্তুতও ছিলো সে জবাব দেবার জন্য। কিন্তু আবু সাঈদ এবং তার কন্যার মুখোভাব লক্ষ্য করে বনহুর একটু আশ্চর্য হয়ে গেলো। পুনরায় চোখ দুটো তুলে ধরলো আবু সাঈদের মুখে।

বিস্ময়কর নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছেন আবু সাঈদ।

নীহারের চোখেও অদ্ভুত দৃষ্টি।

বলেন আবু সাঈদ—আলম, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

ধন্যবাদ! অস্ফুট কণ্ঠে বললো বনহুর।

হাঁ, তোমার মত একজনকে পেয়ে সত্যি আমি শুধু গর্বিত হইনি সার্থক হয়েছি।

মাথা চুলকায় বনহুর—স্যার আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না।

আলম, নাসেরের মুখে শুনলাম তুমি একা নাকি আমার লাঠিয়ালদের তিনজন জোয়ানকে পরাস্ত করেছো। নাসেরকেঁও?

বনহুর বিব্রত বোধ করলো, বললো—স্যার, পরাস্ত ঠিক্ নয়। ওদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করেছি।

আত্মরক্ষা! তার মানে? বললেন আবু সাঈদ।

ছুটির পর অত্যন্ত গরম বোধ করায় পিছন ডেকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই সময় ওরা হঠাৎ আমাকে আক্রমণ করে, তাই আমি সামান্য দু'চারটে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলাম এই যা।

সাবাস আলম। আবু সাঈদ বনহুরের পিঠ চাপড়ে দেন।

নীহারের দিকে দৃষ্টি চলে যায় বনহুরের, অপলক নয়নে সে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে চাহনির মধ্যে ফুটে উঠেছে তার অন্তরের শুভেচ্ছার ছাপ। একটা মিষ্টিমধুর হাসির ক্ষীণ আভা দেখতে পায় বনহুর নীহারের ঠোঁটের কোণে।

আবু সাঈদ এবার বিদায় হন।

চলে যাবার সময় পুনরায় ফিরে তাকায় নীহার বনহুরের দিকে। বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

বেরিয়ে যায় ওরা।

কেশব অবাক হয়ে বলে—বাবু, নাসের সাহেব আর লাঠিয়ালরা আপনাকে....

হাঁ, আমাকে ওরা আচমকা আক্রমণ করেছিলো।

আপনি এ কথা মালিককে না জানিয়ে চুপ করেছিলেন! বাবু, আপনারই গিয়ে আগে কথাটা জানানো উচিৎ ছিলো।

আমি জানতাম মালিককে তারাই গিয়ে জানাবে কাজেই আমি নিশ্চুপ ছিলাম।

বাবু, ওরা মিথ্যা সত্য বানিয়ে লাগাতে পারতো তো?

তা নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু সত্য কোনোদিন গোপন থাকে না কেশব! দেখলে তো তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। ওরা গিয়ে নালিশ জানালো অথচ মালিক এসে ধন্যবাদ জানিয়ে গেলেন আমাকে।

কেশব এবার খুশীর হাসি হাসলো।

বনহুর ক্লান্ত দেহটা শয্যায় সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো—ধীরে ধীরে সব কথা বিস্মৃত হয়ে গেলো সে। নূরীর জন্য মনটা ডুকরে কেঁদে উঠলো, না জানি কোথায় সে বেঁচে আছে কি না—তাও সে জানে না।

নূরীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায় বনহুর।

কেশব ঘুমিয়ে পড়ে নিজের বিছানায়।

শয্যা অসহ্যনীয় হয়ে উঠে বনহুরের কাছে, যতই নূরীর কথা স্মরণ হয় ততই মনটা যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠে। শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে ক্যাবিনের বাইরে। আধো অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়ায়, স্থির দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থাকে সাগরবক্ষে সীমাহীন জলরাশির দিকে।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে, হঠাৎ পিছনে একটা নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়ে ফিরে তাকায় বনহুর। ডেকের আধো অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বেশ বুঝতে পারলো, তার পিছনে অতি নিকটে দাঁড়িয়ে একটি নারীমূর্তি। বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো—মেম সাহেব আপনি!

আরও সরে এলো নীহার, ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। চাপা মিষ্ট কণ্ঠে বললো—আলম!

বলুন মেম সাহেব?

এতো রাতেও তুমি ঘুমাওনি কেন?

বনহুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপনে চেপে নেবার চেষ্টা করলো; কিন্তু পারলো না, বললো—গোটাদিন বয়লারের পাশে থাকতে হয়, শরীরটা বড় রুক্ষ হয়ে পড়েছে তাই ঘুম আসেনি মেম সাহেব!

আলম!

বলুন!

তোমার জীবনের কাহিনী আমাকে শোনাবে?

একটা বেদনার হাসি হাসলো বনহুর—আমার জীবন-কাহিনী আপনি শুনতে চান মেম সাহেব?

হাঁ।

কিন্তু সে অনেক দীর্ঘ কাহিনী, আপনার ধৈর্য থাকবে না।

কোথায় তোমার দেশ? কে তোমার পিতা-মাতা? কি করে এলে তুমি নদীবক্ষে? দেশে তোমার কে কে আছে?

আজ নয় মেম সাহেব, একদিন আপনার ক্যাবিনে বসে সব বলবো আপনাকে। চলুন আপনাকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে আসি।

এরপর আর দাঁড়াতে পারে না নীহার, বলে চলো।

নীহার এগুলো।

বনহুর তার পিছনে চলতে লাগলো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো নীহার, কিছুটা অগ্রসর হবার পর বললো সে—আলম, তোমাকে দেখতে কিন্তু নাবিক বলে মনে হয় না। তুমি কি ভদ্রঘরের সন্তান?

কেন মেম সাহেব, নাবিক তারা কি মানুষ নয়?

না, তা বলছি না বলছি তোমাকে নাবিকের কাজ মানায় না আলম! তুমি লেখাপড়া জানো না?

সামান্য কিছু জানি।

কিন্তু তোমাকে দেখে অনেক বুদ্ধিমান, অনেক জ্ঞানী বলে মনে হয়।

বনহুর মৃদু হাসে।

নীহার বলে আবার—আলম, তোমার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি!

সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ মেম সাহেব।

আলম!

আর এখানে বিলম্ব করা ঠিক নয় মেম সাহেব, চলুন।

চলো।

ক্যাবিনের দরজা অবধি পৌঁছে দেয় বনহুর নীহারকে।

নীহার ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে স্থির নয়নে একবার বনহুরকে দেখে নেয়।

নীহার দরজা বন্ধ করে দেয়।

বনহুর ফিরে যায় নিজের ক্যাবিনে।

❑

ওদিকে জলিলের ক্যাবিনে সমস্ত লাঠিয়াল মিলে গোপন পরামর্শ চলেছে। কেমন করে কাবু করবে নাবিক আলমকে। জীবনে তারা বহু দুষ্ট দুর্দান্ত লোকের সঙ্গে লড়াই করেছে; কিন্তু কারো কাছে এমনভাবে হেরে যায়নি। আজ একটা সামান্য নাবিকের কাছে তারা যেভাবে নাকানি-চুবানি খেয়েছে, আর অপদস্ত হয়েছে এতে তাদের লাঠিয়াল জীবনে যে কলঙ্কের কালিমা পড়েছে, তা কোনোদিন মুছে যাবে না। বিশেষ করে জনাব আবু সাঈদ নাবিক আলমের পক্ষ হয়ে তাদের যা অপমান করেছেন, এর প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত তাদের স্বস্তি নেই।

এ দলে শুধু লাঠিয়ালগণই ছিলো না, ছিলো নাসের এবং তার কয়েকজন অনুগত বন্ধু স্থানীয় জন।

নাসের একটা চেয়ারের হ্যান্ডেলে অর্ধ দন্ডায়মানভাবে ঠেশ দিয়ে বসে ছিলো। কেউ বা মেঝেতে বসে, কেউ বা দাঁড়িয়ে কেউ বা দড়ির খাটিয়ায় অর্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলো।

ক্যাবিনের স্বল্প পাওয়ারের বাল্বের আলোতে এক-একজনের বন্য পশুর মতই লাগছিলো। চোখগুলো জ্বলছিলো ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত।

জলিল দড়ির খাটিয়ায় শায়িত। জাহাজের ডাক্তার বলেছে সম্পূর্ণ দুটো দিন শয্যায় শুয়ে থাকতে। এখনও তলপেটের ব্যথা সেরে যায়নি। জোরে কথা বলতেও কষ্ট হয় তার। কাজেই বাধ্য হয়ে শুয়ে আছে জলিল। তাই বলে মোটেই সে নীরব ছিলো না, মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত পিষে বলছিলো— যতক্ষণ ওকে শায়েস্তা করতে না পেরেছি ততক্ষণ আমি স্বস্তি পাবো না। শপথ করছি, নাবিক আলমকে আমি সাগরের পানিতে ডুবিয়ে মারবো তবেই আমার নাম জলিল মিয়া।

নাসের সম্মুখের টেবিলে মুষ্টিঘাত করলো—আমি ওকে নিঃশেষ না করে নিশ্চিন্ত হবো না। মালিকের ভালোবাসাই শুধু সে জয় করে নেয়নি; আমার ভাবী পত্নী নীহারের মনেও সে আসন গেড়ে নিয়েছে।

শম্ভু বলে উঠলো—ঠিক বলেছেন ছোট স্যার, মেম সাহেব একেবারে ঐ নাবিক ছোকরার প্রেমে পড়ে গেছেন। দেখলেন না, কেমন ওর হয়ে কড়া কথা শোনালো?

হুঁ কিন্তু জানেন, নাসের কড়া কথা হজম করবার লোক নয়। একদিনে আমি ঘুচিয়ে দেবো না প্রেমের লীলা খেলা!

শম্ভু বললো—হুজুরের হুকুমে আমরা সব পারি। একদিন বেটা আমাদের কাবু করেছে কিন্তু অমন আরও কতদিন বাকী আছে। বেটাকে একেবারে পরপারে পাঠিয়ে তবে ছাড়বো।

আস্তে বলো, কেউ শুনে ফেলবে! বললো আর একজন।

নাসের বললো—শুনলো তো বয়েই গেলো। এবার বাড়াবাড়ি করলে শুধু আলম বেটাকেই নয়, স্যারকেও শায়েস্তা করে নেবো।

ক্যাবিনের মধ্যে যখন নানারকম আলাপ-আলোচনা চলছিলো, তখন ক্যাবিনের পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজন সব শুনছিলো। সে অন্য কেউ নয়—স্বয়ং দস্যু বনহুর। নীহারকে তার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে নিজ ক্যাবিনেই চলে গিয়েছিলো সে। হঠাৎ মনে পড়লো একবার জাহাজের পিছন দিকটা দেখে আসা ভালো। কারণ ঐ দিকেই জলিলের গোপন আড্ডা বসে। বিশেষ করে নিজের চেয়ে সে এখন বেশি চিন্তিত আবু সাঈদের জন্য। সন্ধ্যায় আবু সাঈদ ঠিক তার হয়ে ওদের হয়তো কোনো গালমন্দ করেছেন, কাজেই শয়তানের দল ক্ষেপে যেতে পারে। কোনো শলা-পরামর্শ যে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর শয্যাগ্রহণ করতে গিয়ে করতে পারেনি, চলে এসেছে সে ডেকের শেষ অংশে, যেখানে রয়েছে লাঠিয়ালদের বিশ্রাম কামরা।

নাসেরের শেষ কথা শুনে বনহুরের হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হলো। যার জাহাজে বসে দিব্য স্ফুর্তি চালাচ্ছে, তাকে হত্যার পরামর্শ। কি ভয়ঙ্কর লোক এরা! বনহুর নিজের জন্য বিশেষ চিন্তিত নয়, কারণ তাকে কাবু করা নাসেরের দলের কাজ নয়। চিন্তিত হলো সে জাহাজের মালিক ক্যাপ্টেন আবু সাঈদের জন্য।

বনহুর যখন ভাবছে তখন পুনরায় শোনা গেলো জলিলের কণ্ঠ—ছোট স্যার, আমাকে সুস্থ হয়ে উঠতে দিন।

হাঁ, তোমার সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো। দেখো জলিল, স্যার যা মাহিনা দেন তার ডবল দেবো আমি। এ জাহাজ আমার হবে, এ জাহাজের মাল-মসলা আমার হবে। নীহার হবে আমার—তখন তোমরা যা চাইবে তাই পাবে, বুঝলে?

ছোট স্যার, জানি বলেই তো আমরা আপনার কথামত এ জাহাজে এসেছি। আর আপনার কথাকে বিশ্বাস করেই আমরা ধৈর্য্য ধরে আছি।

জলিল আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাদের খুশি করতে কোনোরকম দ্বিধা করবো না। শুধু একটি বাধা ছিলো মালিককে সরানোর ব্যাপার, এখন তার চেয়ে আর একটা বড় মসিবৎ হলো ঐ ছোট লোক বেটা নাবিক

আলম। এ জাহাজে ও আসার পর শুধু মালিক নয়, মালিকের মেয়েটাও ওকে ভালোবেসে ফেলেছে.......

শুধু ভালোবাসা নয় ছোট স্যার, মেম সাহেব তার প্রেমে ডগমগ আর কি। নাসেরের কথার মাঝখানে বললো শম্ভু।

জম্বু বললো—ছোকরার রূপটাই সব মাটি করে দিয়েছে ছোট স্যার। বেটা ছোটলোকের ছেলে কিন্তু দেখেছেন তার চেহারাটা?

ঐ তো হলো সব। না হলে নীহারের মত ধনবানের শিক্ষিতা কন্যা একটা ভিখারী নাবিককে দেখে মুগ্ধ হয় আর তার পিছু লাগে!

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসে। দীপ্ত স্ফীত হয়ে উঠে তার সমস্ত মুখমন্ডল।

❑

কয়েক ঘন্টা পর নাবিক আলমের ডিউটি রয়েছে ইঞ্জিনে। আলম এখন তার শয্যায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। যত চিন্তা আর অশান্তিই থাক নিদ্রাদেবীর কোমল স্পর্শে সব কিছু থেকে বিস্মৃতির পথে সরে এসেছে সে।

এখানে যখন নাবিক আলম মানে দস্যু বনহুর নিদ্রায় মগ্ন, ঠিক তখন জাহাজের মিস্ত্রী কানাই লালের শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো নাসের—পিছনে তার জলিল, শম্ভু আর জম্বু জম্বু আর শম্ভুর হস্তে ছোরা, নাসের আর জলিলের হাতে পিস্তল।

জলিল এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে।

তিন দিন তাকে শয্যায় শুয়ে থাকতে হয়েছিলো সেদিন নাবিক আলমের বুটের লাথি খেয়ে। প্রতিহিংসার বহ্নিজ্বালায় জলিলের হৃৎপিণ্ড জ্বালা করছে ভীষণভাবে। যেমন করে হোক ওকে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তার। শুধু জলিলের নয়, নাসের এবং জম্বুর রাগও অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠেছে। আলমকে হত্যার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওরা।

বনহুর যখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রায় মগ্ন তখন তাকে নিয়ে নাসেরের দলের গভীর আলোচনার অন্ত নেই। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ লড়াই-এর সাহস কারো নেই, কিন্তু কৌশলে ওকে শায়েস্তা করতে হবে।

নাসের জাহাজের প্রধান মিস্ত্রী কানাই লালের কামরায় প্রবেশ করলো—সঙ্গে জলিল, শম্ভু আর জম্বু রয়েছে। জলিল এসে কানাই লালের মুখের চাদর সরিয়ে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা ছুটে গেলো কানাই লালের, দড়বড় উঠে বসে তাকালো, নিজের চোখকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলো না—নাসেরের হস্তে উদ্যত পিস্তলের উপর তার প্রথম নজর পড়লো।

ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকালো কানাইলাল নাসেরের মুখে। তারপর দৃষ্টি তার চলে গেলো নাসেরের পিছনের শম্ভু এবং জম্বুর হস্তে সুতীক্ষ্ণ ছোরাগুলোর উপর। কানাই-এর মুখ হা হয়ে উঠে, ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে বললো—ছোট স্যার!

হাঁ আমি। কানাইলাল, জরুরী একটা কাজে তোমার কাছে এলাম, যদি আমার কথায় রাজী না হও তাহলে মকবুলের মত তোমার অবস্থাও হবে।

কানাইলাল বেতসপত্রের মত থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছে। তার অসহায় চোখ দুটো আর একবার ঘুরে এলো জলিল, শম্ভু আর জম্বুর হস্তস্থিত অস্ত্রগুলোর উপর দিয়ে। ঢোক গিয়ে বললো—কি কাজ আমাকে করতে হবে বলুন ছোট স্যার?

কানাইলাল উঠে দাঁড়ায় শয্যা ত্যাগ করে। হাতের মধ্যে হাত কচলায় সে। বলির পূর্বে মেষশাবকের যেমন অবস্থা হয় তেমনি হয় ওর অবস্থা।

নাসের কঠিন চাপাকণ্ঠে বলে উঠে—জাহাজ এখন চলছে, ইঞ্জিন ক্যাবিনে আছে ফারুক আলী। ওকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে নিচ্ছি, সেই মুহূর্তে ইঞ্জিনের মেইন মেশিন তোমাকে নষ্ট করে দিতে হবে।

জাহাজের মেইন মেশিন নষ্ট.....

হাঁ, তোমাকে নষ্ট করে দিতে হবে।

কয়েক ঘন্টা পর ইঞ্জিনে আসবে আলম। মেইন মেশিন নষ্ট থাকলে সে নিশ্চয়ই ইঞ্জিনের ভিতরে প্রবেশ করে পরীক্ষা কাজ চালাবে। আলম নিজেও অনেক সময় ইঞ্জিনের মেশিন মেরামত করে থাকে। ঠিক্ সে সময় তোমাকে হেড মেশিন চালু করে দিতে হবে.....

ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠে কানাইলাল—আলম যে তাহলে পিষে থেতলে মারা পড়বে?

কি বুঝলে তুমি তাহলে কানাইলাল?

ছোট স্যার, আমি এখনও ঠিক্ বুঝেতে পারছি না কিছু।

সোজা কথায় না বুঝলে মকবুলকে যেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি সেইভাবে দিতে হবে। নাসের হাতের রিভলভারের উদ্যত ডগাটা ঠেকালো কানাইলালের বুকে।

ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে তাকালো কানাইলাল।

নাসের দাঁতে দাঁত কটমট করে রগড়ে নিলো, বললো তারপর— আলমকে পিষে পারতে হবে তোমার, বুঝলে?

এ্যাঁ বলেন কি ছোট স্যার? আলমকে পিষে মারতে হবে?

হাঁ, চলে এসো, আর বিলম্ব নয়।

ছোট স্যার আমি.....মানে......আমি.....

খবরদার, কথা বলবে না—কোনোরকম আপত্তি করলে শম্ভু জম্বু আর জলিল তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

চলুন কি করতে হবে।

নাসের ইঙ্গিৎ করলো জলিল, জম্বু আর শম্ভুকে।

বেরিয়ে গেলো ওরা।

❑

জাহাজের ইঞ্জিনরুমে তখন ফারুক আলীর ডিউটি ছিলো। জলিল, জম্বু আর শম্ভু এসে দাঁড়ালো, চট করে মুখে কাপড় চাঁপা দিয়ে ওকে টেনে নিলো বয়লারের পেছনে।

ঐ মুহূর্তে নাসেরের সঙ্গে ইঞ্জিনরুমে প্রবেশ করলো মিস্ত্রী কানাইলাল, বাধ্য ছাত্রের মত তার পেছনে পেছনে এগিয়ে এলো।

নাসের ইঙ্গিৎ করলো কানাইলালকে।

কানাইলাল চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর মেইন মেশিনের পাশে এসে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক মিনিট—তারপর বেরিয়ে এলো সে। যেমনভাবে এসেছিলো তেমনি আলিগোছে বেরিয়ে গেলো নাসের আর কানাইলাল।

বয়লারের পিছন থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো ফারুক আলীকে। জানিয়ে দিলো জলিল, শম্ভু আর জম্বু—আমাদের কথা যদি প্রকাশ পায় তাহলে নাবিক মকবুলের মত তারও অবস্থা হবে।

জলিল, শম্ভু আর জম্বুর চেহারা দেখেই পিলে চমকে গিয়েছিলো ফারুক আলীর। কোনোরকমে তাদের কাছে কান ধরে শপথ করে চলে এলো ইঞ্জিনকক্ষে।

কিন্তু ডিউটি তার শেষ হয়ে গিয়েছিলো, আলম আসতেই সে চলে গেলো।

বনহুর নিদ্রা জড়িত আঁখি দুটি রগড়ে হাই তুললো।

নাসের আর কানাইলাল ইঞ্জিনরুম থেকে বেরিয়ে গেলেও ওরা দু'জন লুকিয়েছিলো আড়ালে।

বনহুর মেশিনে হাত দিতেই অনুভব করলো কেমন একটা কড়কড় শব্দ হচ্ছে ইঞ্জিনের ভিতরে। অল্পক্ষণ পরই মেইন মেশিন অকেজো হয়ে পড়লো।

বনহুর চেষ্টা করলো নানাভাবে কিন্তু বাইরে থেকে কিছুই বুঝতে পারলো না। ইঞ্জিনের হেড সুইচ অফ করে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো সে, নেমে গেলো নীচে।

এই সুযোগের প্রতীক্ষায়ই ছিলো ওরা।

বনহুর ভিতরে প্রবেশ করে ইঞ্জিনের নীচে কল-কব্জা পরীক্ষা করলো, ঠিক সেই মুহূর্তে নাসের কানাইকে মেশিন চালু করে দেবার জন্য আদেশ করে।

কানাই-এর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠে, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ের ঘা পড়ছে। শুষ্ক কণ্ঠে বলে উঠে কানাইলাল—ছোট স্যার, আমাকে মাফ করবেন, আমি পারবো না মাফ করবেন.....

সঙ্গে সঙ্গে একটা হীম-শীতল শক্ত অনুভূতি করলো কানাইলাল নিজের পিঠে। শিউরে উঠলো ওর সমস্ত শরীর, ঠান্ডা হয়ে গেলো বুক। একটা কথাও আর উচ্চারণ করতে পারলো না, যন্ত্রচালিতের মত এগিয়ে গেলো কানাইলাল ইঞ্জিন রুমের মধ্যে। হ্যান্ডেলে হাত রাখতেই থরথর করে কেঁপে উঠলো হাতখানা। ফিরে তাকালো সে, ওদিকে দেখলো নাসেরের হস্তে জমকালো পিস্তলের নলটা উঁচু হয়ে আছে ঠিক তার দেহ লক্ষ্য করে। কানাইলাল আর ভাবতে পারলো না, চাপ দিলো হ্যান্ডেলের চাকায়।

সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের হেড মেশিন কর্কশ আওয়াজ করে চলতে শুরু করলো। নিস্তব্ধ মেশিন কক্ষ থেকে ভেসে এলো একটা তীব্র আর্তনাদ—উঃ—উঃ—আঃ—আঃ!

কানাইলাল আর নাসের ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ইঞ্জিনের বিকট শব্দে ফায়ারম্যানগণ এবং কয়েকজন খালাসী ছুটে এলো ইঞ্জিনকক্ষে। তারা বুঝতে পারলো, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন নাবিক হেড মেশিন বন্ধ করে দিলেন।

ততক্ষণে জাহাজের বিপদ সংকেত ঘন্টাধ্বনি শুরু হয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিন কক্ষে এসে জমায়েত হলো সমস্ত জাহাজের লোক। যারা ঘুমাচ্ছিলো তারাও সবাই এসে ঘিরে দাঁড়ালো—কি হলো কি হলো সবার মনেই দারুণ উৎকণ্ঠা।

ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ এবং নীহারও ছুটে এলেন।

ক্যাপ্টেনের চোখেমুখে দারুণ আতঙ্কের ছাপ—না জানি আজ আবার কি ঘটলো! তিনি সবার অগ্রে এসে দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

একজন নাবিক চঞ্চল কণ্ঠে বললো—স্যার, জাহাজের হেড ম্যাশিন নষ্ট হয়ে গেছে। এক্ষুণি জাহাজে আগুন ধরে যেতো। ইঞ্জিন কক্ষে কেউ ছিলো না, আমি এসে মেশিন বন্ধ করেছি।

কথাগুলো বলতে গিয়ে বড্ড হাঁপিয়ে পড়ছিলো নাবিক বেচারী। কারণ সে যদি ঐ মুহূর্তে দ্রুত ছুটে এসে হেড মেশিন বন্ধ করে না দিতো তাহলে ইঞ্জিনে আগুন লেগে যেতো তাতে কোনো ভুল নেই। ভাগ্যক্রমে সে ঠিক মুহূর্তে এসে পড়েছিলো তাই রক্ষা পেয়েছে জাহাজখানা—শুধু জাহাজখানাই নয়, জাহাজের যাত্রীগণ প্রাণ রক্ষা পেলো।

আবু সাঈদ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—এখন ইঞ্জিনরুমে কার ডিউটি ছিলো?

ভীড় ঠেলে কেশব এসে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে খালাসীর কাজ করে সে। মাঝে মাঝে ফায়ারম্যানের কাজও করতে হয় তাকে। কোনো কোনো সময় নাবিক আলমের সঙ্গে মেশিন পরিস্কার বা তাকে অন্যান্য কাজে সহায়তা করতে হয়। গোটাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় ছুটি হয়। কেশব কোনোদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেনি, এখন তাকে যথেষ্ট খাটুনি করতে হচ্ছে, কাজেই ছুটি হলেই গিয়ে দড়ির খাটিয়ায় নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে শুরু করে। কেশবের বুকের মধ্যে ধক করে উঠলো—এখন তো তার বাবুর ডিউটি ছিলো! একটু পূর্বেই তো সে তাকে জাগিয়ে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করতে বলে বেরিয়ে এসেছিলো। কেশব প্রতিদিনের মত নিদ্রা-অলস দেহটা কোনো রকমে উঠিয়ে ক্যাবিনের দরজাটা বন্ধ করে পুনরায় ধপাস করে শুয়ে পড়েছিলো, তারপর ভাল করে ঘুম না আসতেই জাহাজের বিপদ সংকেত ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো এবং সেই শব্দ শুনে ছুটে এসেছে সে বাবুর সন্ধানে। কেশব প্রায় কেঁদেই ফেললো—হুজুর, আলম সাহেব এখন ডিউটিতে ছিলেন।

আঁতকে উঠেন আবু সাঈদ—বলো কি—আলম ছিলো! কিন্তু সে কোথায়?

ঠিক তখন ভিড়ের অদূরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে আলাপ হচ্ছিলো। তাদের কানেও এসে পৌঁছলো আবু সাঈদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর। নাসের বললো—শয়তানটার খোঁজ হচ্ছে।

জম্বু বললো—আর পাবে কোথা, বেটার হাড়-মাংস পিষে দলা গয়ে গেছে।

শম্ভু বললো—শুধু দলা নয়, বেটার দেহটা এখন মেশিনে। চাকার দাঁতে দাঁতে লেপটে আছে মাত্র। আখ-মাড়াই কলের মত রক্তগুলো নিংড়ে পড়েছে মেঝেতে।

জলিল দাঁতে দাঁত পিষে বললো —যেমন বাছাধন তেমনি তার সাজা হয়েছে। ছোট স্যার, এখন যান, মালিককে সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করুন। নইলে সব ফাঁস হয়ে যাবে।

তার মানে?

মানে এখন ওখানে আপনাকে না দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে।

ঠিক বলছো জলিল। নাসের কথাটা বলে এগিয়ে গেলো।

নাবিক আলমের সন্ধানে উপস্থিত সবাই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সমস্ত জাহাজেলোক ছুটলো—কোথায় সে? চারদিক থেকে সবাই ফিরে এলো—নাবিক আলমকে পাওয়া যাচ্ছে না।

নাসের ধূর্ত শিয়ালের মত সুরসুর করে এসে দাঁড়ালো, যেন এইমাত্র শোরগোল শুনে জেগে উঠে এলো সে। চোখ রগড়ে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললো—স্যার কি হয়েছে?

আবু সাঈদ রাগত কণ্ঠে বললো—এতোক্ষণে বুঝি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হলো?

শয়তান নাসের আবু সাঈদের ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রাগান্বিত না হয়ে বরং খুশি হলো, তার নিদ্রার ভান তাহলে তিনি ধরতে পারেননি। এবার যুৎসই কথা বলার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিলো। আবু সাঈদের কথায় সে যেন বেশ আহাম্মক বনে গেছে, এমনি ভাব নিয়ে বললো—বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম স্যার।

নীহারের মাথার মধ্যে তখন আলমের অন্তর্ধান নিয়ে গভীর চিন্তার উদ্বেগ হচ্ছিলো। অজানিত একটা আতঙ্ক মোচড় দিচ্ছিলো তার মনে। নাসেরের ভণ্ডামি—ভরা নেকামি কথায় পা থেকে মাথা অবধি জ্বালা করে উঠে ওর। গম্ভীর-গলায় বলে উঠে নীহার—এতো হৈচৈ-এর মধ্যেও যে ঘুমিয়ে থাকতে পারে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কারণ ঘুম তার সত্য নয়—মিথ্যা।

আবু সাঈদ তখন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আলম গেলো কোথায়? নীহারের কথা বা নাসেরের উক্তি তার মাথায় তখন প্রবেশ করছিলো না।

নাসের এই সুযোগে পুনরায় আর একবার নিজেকে সচ্ছ করে নেবার চেষ্টা করলো বললো—স্যার আপনি তাকে যতখানি ভাল মানুষ মনে করেছেন ঠিক ততখানি নয়। জাহাজখানা ধ্বংস করে ফেলার জন্য সে এইভাবে মেশিন চালু করে রেখে ভেগেছে।

ভেগেছে। একটু ধ্বনি করে উঠলেন আবু সাঈদ।

হাঁ! আমার মনে হয় জাহাজ ত্যাগ করে সে পালিয়েছে।

অসম্ভব। চলন্ত জাহাজ থেকে পালানো অসম্ভব। বললেন আবু সাঈদ।

নাসের দাঁত বের করে একটু ব্যাঙ্গপূর্ণ হাসি হাসবার চেষ্টা করে বলে—স্যার, অসম্ভব তার কাছে কিছুই নয়।

এমন সময় একজন নাবিক ছুটে আসে—হুজুর ইঞ্জিনের নীচে মেশিন রুমে দেখুন। আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম।

নাবিকটার কথা শেষ হয় না, একসঙ্গে আবু সাঈদ এবং নীহার উচ্চারণ করে উঠেন—কি বললে?

হুজুর আমি একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম কিন্তু শব্দটা কোথা থেকে এলো বুঝতে পারিনি কারণ তখন মেশিনে একটা ভয়ঙ্কর কড়কড় শব্দ হচ্ছিলো।

নীহার ব্যস্তকণ্ঠে বললো—আব্বা, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিৎ হবে না, শীগগির মেশিন কক্ষে খোঁজ নিন।

নীহারের কথায় মিটি মিটি হাসলো নাসের জানে সে এতোক্ষণে নাবিক আলমের হাড়গোড়ো সব চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে ছিটকে পড়েছে মেশিনের দাঁতের চারপাশে। এবার সে প্রস্তুত হয়ে নিলো আলমের পরিণতি সচক্ষে দেখবে—দেখবে যে হস্তদ্বয় দ্বারা সে তাদের নাক, মুখ -দাঁতের রক্ত বের করে দিয়েছিলো সেই হস্তদ্বয়ের কি অবস্থা হয়েছে। যে পা দিয়ে জলিলের তলপেটে চরম আঘাত করেছিলো সেই পা দুটির কি অবস্থা হয়েছে।

আবু সাঈদ হুকুম দিলেন দু'জন নাবিককে ইঞ্জিনের নীচে মেশিন-রুমে প্রবেশ করতে।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করা হলো।

দু'জন নাবিক প্রবেশ করলো নীচে।

কেশবও এই মুহূর্তে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো না। সেও ওদের দু'জনার সঙ্গে নেমে পড়লো মেশিন-রুমে।

নাবিকদ্বয় ও কেশব মেশিন-রুমে নেমে যেতেই নীহার দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরলো। সত্যই যদি নাবিক আলম মেশিনের চাকায় নিষ্পেষিত হয়ে থাকে-- না না, এ দৃশ্য সে সহ্য করতে পারবে না।

ঠিক ঐ দণ্ডেই মেশিন-রুমের ভিতর হতে একসঙ্গে নাবিক দু'টি এবং কেশব আর্ত চীৎকার করে উঠলো—কেশবের গলা স্পষ্ট শোনা গেলো—বাবু বাবু হায়--হায় হায়, একি হয়েছে—বাবু একি হয়েছে---

নীহারের বুকে তীরফলকের মত বিদ্ধ হলো শব্দগুলো, আর সে দাঁড়াতে পারলো না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। ছুটে পালিয়ে গেলো নীহার নিজ কামরার দিকে। আলমের ঐ সুন্দর দেহটা নিষ্পেষিত অবস্থায় সে দেখতে পারবে না।

নাবিক দু'টির গলাও শোনা গেলো—হুজুর, সর্বনাশ হয়ে গেছে। সর্বনাশ হয়ে গেছে--

আবু সাঈদের সংজ্ঞা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তিনি যেন মাতালের মত টলছেন। তবু খেয়াল করে বললেন—আরো দু'জন মেশিনের ভিতরে যাও, দেখো আলমের কি অবস্থা হয়েছে।

আবু সাঈদ ক্ষিপ্তের মত ইঞ্জিন রুমের পাশে পায়চারী শুরু করলেন। হঠাৎ এমন একটা বিপদ ঘটবে বা ঘটতে পারে কল্পনাও করতে পারেনি তিনি।

অল্পক্ষণ পর চার-পাঁচজনে ধরে নাবিক আলম-বেশি বনহুরের ক্ষত-বিক্ষত দেহটা নিয়ে এলো বাইরে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে ওর নাবিক ড্রেস।

ডেকের উপরে শুইয়ে দেওয়া হলো বনহুরকে।

আবু সাঈদ বাহুর মধ্যে মুখ ঢেকে ফেললেন।

জাহাজের সবাই দারুণ অনুশোচনায় ভেংগে পড়লো। সবাই আঁতকে উঠলো এ দৃশ্য দেখে। কেউ চোখ ঢাকলো, কেউ বা কষ্টে তাকালো। কেউ কেউ দেখতে না পেরে সরে গেলো দূরে।

নাবিকগণ আলমকে শুইয়ে দিলে পরে আবু সাঈদের আদেশে জাহাজের ডাক্তার পরীক্ষা করলেন, বললেন তিনি—স্যার বরাৎ বলতে হবে, নাবিক আলমের মৃত্যু ঘটেনি; সে এখনও জীবিত আছে।

আবু সাঈদ যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলেন, তিনি নিশ্বাস নিলেন নতুন করে। কেশবের অবস্থাও তাই—সে রোদন করছিলো।

ডাক্তারের প্রশ্নে জবাব দিলো নাবিকগণের মধ্যে হতে একজন, বললো—মেশিনের নীচে এক পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়েছিলো আলম। ভাগ্যিস তার দেহটা দাঁতের ফাঁকে আটকা পড়ে যায়নি, তাহলে ছাতু হয়ে যেতো একেবারে।

ডাক্তার ভালভাবে পরীক্ষা করে আরও বললেন—হাত পা বা দেহের হাড়গোড় ভেংগে যায়নি। শুধু দেহের মাংসগুলো স্থানে স্থানে কেটে গেছে এবং আঘাত পেয়েছে অত্যন্ত।

কেশব আলমের বুকে এসে আছড়ে পড়লো কিন্তু তাকে সরিয়ে নেওয়া হলো সেখান থেকে।

ডাক্তার যখন আলম সম্বন্ধে জীবিত আছে বলে প্রমাণ দিলেন এবং জানালেন আঘাত ভয়ঙ্কর হলেও গুরুতর নয়—তখন নাসেরের মুখ অমাবস্যার অন্ধকারের মত কালো হলো। ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতে সরে পড়লো সেখান থেকে।

আবু সাঈদ কয়েকজন নাবিককে বললেন আলমকে তার ক্যাবিনের শয্যায় নিয়ে গিয়ে যত্ন সহকারে শুইয়ে দিতে। কারণ এক্ষুণি তার চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

বনহুরকে অজ্ঞান অবস্থায় তার নিজস্ব ক্যাবিনে শুইয়ে দেওয়া হলো তার বিছানায়।

আবু সাঈদ স্বয়ং এলেন ডাক্তারের সঙ্গে, চোখেমুখে তার সেকি ব্যাকুলতা! যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে ওকে। আলমের মত একজন ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন তাদের জাহাজে। সেদিন আলম একা তার জাহাজের লাঠিয়ালদের ক'জনাকে কাবু করে ফেলেছিলো, শুধু দৈহিক শক্তিশালীই সে নয়—তার কর্মনিষ্ঠা অত্যন্ত বিমুগ্ধ করেছিলো মালিককে। পর্যটক হিসাবে তাঁকে গোটা বছর ঘুরে ফিরতে হয় দেশ হতে দেশান্তরে। কখন কোন দেশে যান তার কোনো ঠিক নেই।

অজানা-অচেনা জায়গা আবিষ্কার করাই হলো তার কাজ। যেমন বিভিন্ন দেশ-বিদেশ ঘুরে ফিরতে হয়, তেমনি নানারকম বিপদ আপদেও পড়তে হয়। এবং সেই কারণেই জাহাজে তিনি বেশ কিছুসংখ্যক দেহরক্ষী রেখেছিলেন। আলমকেও আবু সাঈদ পছন্দ করেছিলেন একজন কৌশলী

বুদ্ধিমান শক্তিশালী সঙ্গী হিসাবে। আজ সেই আলমের অবস্থা দেখে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছিলো তাঁর। অনেক কষ্টে সংযত করে রাখছিলেন তিনি নিজেকে।

ডাক্তার আলমের ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। ইন্‌জেক্‌শন করলেন কয়েকটা।

নাসেরের দল ছাড়া এ জাহাজে আলমকে ভালোবাসতো সবাই। ওর ব্যবহারে কেউ অসন্তুষ্ট ছিলো না, বরং সবাই খুশি ছিলো। অবশ্য এর কারণ ছিলো—জাহাজের ছোট-বড় সকলকে সে সমান চোখে দেখতো। সুযোগ পেলেই তাদের সহায়তা করতো কাজে।

একদিন আলম পিছন ডেক অভিমুখে যাচ্ছিলো, তখন একজন খালাসী ভারী কোন একটা বস্তু উপরে উঠানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তখন আশে পাশে কেউ ছিলো না তাকে সাহায্য করবার মত। অসহায় খালাসী ঘর্মাক্ত দেহ নিয়ে চেষ্টার পর চেষ্টা করে চলেছে।

আলমের দৃষ্টি স্থির হলো খালাসীটার উপরে, এগিয়ে গেলো সে ওর পাশে নির্বিঘ্নে তাকে সাহায্য করলো। আর এক দিন একজন নাবিক তার ডিউটিকালে হঠাৎ পেটের ব্যাথায় অস্থির হয়ে পড়লো। কিন্তু ডিউটি তাকে করতেই হবে। ঐ সময় আলম তার কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছিলো, হঠাৎ নাবিকের মুখোভাব লক্ষ্য করে সে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে তার। নাবিক তার অস্বস্তির কথা জানালো। আলম তাকে ঐ মুহূর্তে বিশ্রাম করতে বললো—সে তার ডিউটি সময়টা চালিয়ে নেবে বলে তাকে আশ্বাস দিলো।

নাবিক কৃতজ্ঞতায় নত হলো আলমের কাছে।

এমনি আরও কতজন আলমের এ করুণ অবস্থা দর্শনে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

ভীড় জমে গেলো আলমের ক্যাবিনে।

কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশে সবাইকে ক্যাবিন ত্যাগ করতে হলো। চলে গেলেও তাদের অন্তর যেন পড়ে রইলো আলমের পাশে, ব্যথা বেদনা নিয়ে নিজ নিজ স্থানে গমন করলো ওরা।

নীহার তখন নিজের ক্যাবিনে বালিশে মুখ গুজে পড়ে আছে। আজ সে উপলব্ধি করছে—কখন সে নাবিক আলমকে এতখানি ভালবেসেছিলো, কখন তার মনের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলো ওকে! আজ আলমের মৃত্যুর

সংবাদ তাকে উন্মাদিনী করে ফেলেছে। মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলো নীহার। কেন তবে ও এসেছিলো তাদের জাহাজে। না এলে এমন তো হতো না। তার জীবন ছিলো স্বাভাবিক—সচ্ছ। হাসি আর আনন্দই ছিলো পরম সম্পদ—কিন্তু যেদিন থেকে ওকে সে দেখেছে কেন সে নিজেই জানে না হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। আগের নীহার পাল্টে গিয়েছিলো ক'দিনের ব্যবধানে। প্রকৃতির চলার গতির পথে ঋতু যেমন বয়ে আনে পরিবর্তন, ভাবগম্ভীর বসুন্ধরা বিভাসিত হয়ে উঠে যেমন বসন্তের আগমনে তেমনি নীহারের মধ্যে নাবিক আলম এনেছিলো এক ছন্দের শিহরণ। ধনবান দুহিতা বিদুষী সে; সামান্য একজন নাবিকের মধ্যে খুঁজে নেবে তার প্রিয়জনকে এ যে কল্পনাতীত!

প্রেম -প্রীতি-ভালবাসা, স্নেহ-মায়া-মমতা কোনদিন জাতি বা স্থান-কুল বিচার করে না। নীহারও নিজের অজান্তে ওকে মনের গহনে আসন দিয়ে বসেছিলো। আজ সে উপলব্ধি করে বিশেষ করে সবকিছু।

নীহার যখন অন্ধকার ক্যাবিনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে তখন আস্তে করে ক্যাবিনে প্রবেশ করে নাসের। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে ওকে। হাসে নাসের আপন মনেই কারণ সে জানে নীহারের কান্না কিসের জন্য।

সরে আসে একেবারে নীহারের শয্যার নিকটে পিঠে হাত রেখে ডাকে সে গলাটাকে কোমল করে নিয়ে—নীহার!

চমকে মুখ তোলে নীহার। সোজা হয়ে বসে, দ্রুত হস্তে চোখের পানি মুছে ফেলে বলে—আপনি কেন এখানে?

নাসের কেঁচোর মত হাত দু'খানা কোটের পকেটে পুরে নিয়ে মুচকি হেসে বললো—চোখের পানি মুছে ফেললে কেন নীহার? কাঁদো আরও কাঁদো—বরফ যখন গলতে শুরু করেছে তখন আর থামবে না।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে নীহার—বেরিয়ে যান।

যদি না যাই?

আব্বাকে ডাকবো।

আব্বা! আব্বা এখন তোমার সেই নাবিকটার মৃতদেহের সৎকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

নীহার নিজের মাথাটা চেপে ধরে দু'হাতে ভুলে যায় নাসের তার পরম শত্রু, বলে সে ব্যাকুল কণ্ঠে—নাসের সাহেব আলম মারা পড়েছে!

হাঁ, মেশিনের দাঁতের ফাঁকে পিষে গেছে তার হাড়গোড় মাংসের দলা বনে গেছে ওর দেহটা।

উঃ! শেষ পর্যন্ত ওর এই অবস্থা? নীহার টলতে লাগলো মাতালের মত।

নাসের নীহারকে ধরে ফেললো টেনে নিলো নিবিড় করে বুকের মধ্যে। এই আশাতেই সে আজ এসেছে নীহারের ক্যাবিনে সকলের অনুপস্থিতিতে।

নীহারের অসংযত দেহ থেকে আঁচলখানা খসে পড়ে। যৌবনভরা অনিন্দ্য-স্লথ বক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোভাতুর নাসেরের চোখ দুটো শ্বাপদের মত জ্বলে উঠে জ্বলজ্বল করে। আরও ঘনিষ্ঠ করে টেনে নেয় ওকে বাহু দুটির মধ্যে।

কিন্তু নীহার জ্ঞান হারায়নি, একটু মাথাটা ঘুরে গিয়েছিলো নাসেরের কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে। অল্পক্ষণেই নীহার নিজেকে সামলে নিলো, নাসেরের আচরণে নাগকন্যার মত রুখে উঠলো। এক মোচড়ে নাসেরের বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে প্রচন্ড এক চড় বসিয়ে দিলো ওর গালে।

নাসের গালে হাতটা একবার বুলিয়ে নিলো আলগোছে। কিছু যেন হয়নি হাসলো সে নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে, নেশা চেপে গেছে ওর মাথায় নীহারের অপরূপ যৌবনসুধা পান করতেই হবে। খপ্ করে ধরে ফেললো নাসের পুনরায় ওকে। বলিষ্ঠ কঠিন হাতে ওকে চেপে ধরে মুখের কাছে মুখটা নিয়ে এলো।

নীহার নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য ধস্তাধস্তি করতে লাগলো, ভীষণভাবে কামড়ে দিলো নাসেরের হাতে।

নাসেরের মধ্যে তখন জেগে উঠেছে একটা পাপান্ধ পশুত্ব বোধ। নীহারের দাঁত হাতের পিঠে বসে গেলেও নাসের তাকে মুক্ত করে দিলো না।

নীহার প্রাণপণে নিজেকে বাঁচিয়ে নেবার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয় করে চলেছে।

আর নাসের ওকে পাওয়ার জন্য হিংস্র হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্করভাবে। নীহারের মুখের কাছে ওর কঠিন লোভাতুর ওষ্ঠদ্বয় এগিয়ে আসছে চুম্বকের মত।

নীহার ঘেমে উঠেছে—যেন গোসল করেছে সে। হাঁপাচ্ছে রীতিমত। নাসেরও হাঁপাচ্ছে, যেন দুটি যুদ্ধরত ছায়ামূর্তি।

ক্যাবিনে স্বল্প আলো জ্বলছিলো।

ক্রমে নীহারের দেহ শিথিল হয়ে আসছে যেন। হাজার হলেও সে নারী, শক্তির দিক দিয়ে নাসেরের চেয়ে অনেক দুর্বল সে। কতক্ষণ পেরে উঠবে এভাবে লড়াই করে।

নীহার এবার প্রাণ দিয়ে স্মরণ করে খোদাকে, হে দয়াময়, তুমি আমাকে রক্ষা করো, রক্ষা করো ইজ্জৎ বাঁচাও তুমি --- নীহারের কণ্ঠ দিয়ে কথাগুলো একরকম জোরেই বেরিয়ে এলো নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে।

নাসের তখন নেশাযুক্ত মত্তের মত হুশহারা। কোনো কথাই তার কানে পৌঁছাচ্ছে না। সে নীহারের দেহটাকে নিস্পেষিত দলিত-মথিত-নিঃশেষিত করে ফেলতে চাইছে।

নীহারের বাধা দিবার ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস হয়ে আসছে। অবশ হাত দু'খানা ঝুলে পড়ে দু'পাশে। ঠিক ঐ মুহূর্তে ক্যাবিনের বাইরে শোনা যায় আবু সাঈদের কণ্ঠ—নীহার! নীহার—মা মনি।

আবু সাঈদের গম্ভীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বরে হুঁশ ফিরে আসে, নাসের তাড়াতাড়ি নীহারকে মুক্ত করে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

আবু সাঈদ ক্যাবিনে প্রবেশ করে বলেন—নীহার মা আলম মরেনি। আলম বেঁচে আছে, আলম বেঁচে আছে--- হঠাৎ নীহারের উপর দৃষ্টি পড়তেই দেখলেন নীহার দাড়িয়ে দাড়িয়ে টলছে যেন, ব্যস্তভাবে বললেন— একি মা, কি হয়েছে তোমার?

ওদিক থেকে নাসের এগিয়ে আসে, দ্রুতহস্তে রুমাল দিয়ে নিজের কপালের বিন্দু বিন্দু ঘামগুলো মুছে ফেলছে সে, হন্তদন্ত কণ্ঠে বলে—হঠাৎ আলমের এ্যাকসিডেন্ট সংবাদে নীহার সংজ্ঞা হারার মত হয়ে পড়েছিলো, তাই আমি ওকে---

ও তাই বলো। বেশ করেছো নাসের আমি তো আলমকে নিয়ে এতোক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। কি যে দুর্ভাবনা হয়েছিলো আমার। যাক ডাক্তার বলেছেন আঘাত গুরুতর হলেও মৃত্যুর কোনো সম্ভাবনা নেই। নীহারের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

আমি তাহলে আসি স্যার।

আচ্ছা এসো বাবা। ইস্ কি উপকারটাই না করেছো তুমি! তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবু সাইদের ধন্যবাদ গ্রহণ করার মত স্থিরচিত্ত তখন ছিলো না নাসেরের। মুখের গ্রাস হারিয়ে হিংস্র জন্তু যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ঠিক

তেমনি অবস্থা নাসেরের। কিন্তু সরে না পড়ে কোনো উপায় নেই। তাই আর কোনো কথা না বাড়িয়ে প্রস্থান করলো সাধু ব্যক্তির মত মন্থর পদক্ষেপে।

শুধু শিকার হারিয়ে নয়—আলম জীবিত আছে; তার মৃত্যুর সম্ভাবনা আর নেই জেনে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। সমস্ত দেহে এবং মনে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। হিংসার বহ্নিজ্বালা যাকে বলে।

আবু সাঈদ নীহারের কাঁধে হাত রাখলেন—নীহার! নীহার --নীহার ধপ করে বসে পড়লো শয্যার উপরে, গলা শুকিয়ে গেছে এতক্ষণ শয়তানটার ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে। কিন্তু এত বিপদের মধ্যেও যখন নীহারের কানে ঐ একটিমাত্র শব্দ এসে পৌঁছলো—মা আলম বেঁচে আছে --সে মরেনি—মৃত্যুর সম্ভাবনা আর নেই--অনবিল এক শান্তিতে নীহারের বুক থেকে একটা কঠিন চাপ যেন নেমে গেলো মুহূর্তে। কথা সে বলতে পারলো না সহজে কিন্তু সমস্ত ব্যথা ভুলে গেলো। বসে পড়লো শয্যায়, শুকনো জিভটা একবার ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিয়ে বললো—আব্বা একটু পানি দাও---

পানি! পানি খাবে মা? সবুর করো, এক্ষুণি আনছি। আবু সাইদ টেবিলে ঢাকা দেওয়া পানির গেলাসটা হাতে তুলে নিয়ে কন্যার দিকে এগিয়ে গেলেন—নাও।

নীহার পিতার হাত থেকে পানির গেলাসটা নিয়ে এক নিশ্বাসে ঢক ঢক করে পান করে ফেলে।

আবু সাঈদ দেহ থেকে স্লিপিং গাউনটা খুলে রাখতে রাখতে বললেন—কি বলবো মা, আলমের অবস্থা দেখে আমিই সংজ্ঞা হারাতে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম, ছেলেটা মারা পড়েছে। ডাক্তার যখন বললেন ভয়ের সম্ভাবনা নেই তখন আমি আশ্বস্ত হয়েছি। উঃ বেচারী একটুর জন্য বেঁচে গেছে।

নীহার তখনও হাঁপাচ্ছিলো, পিতার কথাগুলো তার কানে প্রবেশ করেছিলো কিনা কে জানে। রাগে অধর দংশন করছিলো নাসেরের আচরণ সম্বন্ধে পিতাকে সব বলবে কিনা ভাবছে! শয়তানটা তার আব্বাকে সুন্দর একটা সান্ত্বনা দিয়ে নিজেকে সচ্ছ করে নিয়ে বেরিয়ে গিলো।

আবু সাঈদ ভাবলেন সত্যিই নাসের তার কন্যাকে যত্ন সহকারে আগলে রেখেছিলো তাই ধন্যবাদ জানাতে তিনি ভুললেন না। নীহার বললো—আব্বা, নাসের সাহেবকে তুমি ধন্যবাদ জানালে কিন্তু জানো সে কত বড় অন্যায় করেছে?

সে কি মা? কি করেছে সে?

ওর মত শয়তান আমাদের জাহাজে দ্বিতীয় জন নেই। সুযোগ বুঝে সে আমাকে ---মানে আমার উপর আক্রমণ চালিয়েছিলো---আমাকে --- আমাকে ---কণ্ঠ আটকে আসে, বলতে পারে না নীহার স্পষ্ট করে সব কথা।

আবু সাঈদ চমকে উঠেন, উদ্বিগ্নভাবে বললেন—কি হয়েছে মা বলো?

আজ নয় আব্বা। আজ কিছু বলতে চাই না কিন্তু জেনে রেখো নাসের সাহেব শুধু শয়তান নয়, সে একজন এক নম্বর লম্পট।

আবু সাঈদ গম্ভীর হয়ে পড়লেন চোখমুখ তার কালো হয়ে উঠলো। বুঝতে পারলেন নাসের তাহলে কোনো কু'মতলব নিয়েই নীহারের পাশে এসেছিলো। রাগে ক্ষোভে পায়চারী শুরু করলেন তিনি। নাসেরকে আবু সাঈদ স্নেহের দৃষ্টি নিয়েই দেখতেন, বন্ধুপুত্র বলেই শুধু নয়—নাসের শিক্ষিত সুদর্শন এবং বুদ্ধিদীপ্ত ছেলে, নীহারের সঙ্গে সুন্দর মানানসই হবে। তাছাড়াও নাসেরকে তিনি পেয়েছিলেন সর্বসময় নিজের পাশে পাশে পর্যটক হিসাবে। নানা কারণে আবু সাঈদ নাসেরকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি ঐ সর্বগুণ সম্পন্ন ছেলেটিই তার কতখানি অমঙ্গল কামনা করে।

❑

বোম্বে ষ্টুডিও।

পরিচালক আসলাম আলীর ওপেল কার গাড়ীখানা এসে থামলো তিন নাম্বার ফ্লোরের সামনে। গাড়ী থেকে নামলেন পরিচালক স্বয়ং এবং বশির আহাম্মদ। নায়িকা শ্যামা এবং আর একটি যুবতী সঙ্কোচিতভাবে নেমে দাঁড়ালো গাড়ী থেকে।

আসলাম আলী শ্যামা ও যুবতীটিকে লক্ষ্য করে বললেন —এসো তোমরা।

পরিচালককে অনুসরণ করলো ওরা সবাই।

সহকারী বশির আহম্মদও এগুলেন সবার পিছনে।

শ্যামা যুবতীটির দক্ষিণ হাতখানা তুলে নিলো হাতে—কোনো ভয় নেই।

যুবতীর রক্তিম গন্ড আরও রক্তিম দেখাচ্ছে অসহায় করুণ চোখে একবার তাকালো শ্যামার দিকে।

ফ্লোরে প্রবেশ করেই বললেন আসলাম আলী—শ্যামা ওকে নিয়ে গ্রীণরুমে যাও। আমি সেট থেকে ফিরে আসছি। বশির তুমিও এসো।

শ্যামা মৃদু হেসে গ্রীবা বাঁকা করে বললো—চট্ করে আসবেন কিন্তু।

হাঁ, এক্ষুণি এসে যাচ্ছি শ্যামা তুমি ওকে ওর চরিত্রটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দাও।

আসলাম আলী ও বশির আহম্মদ চলে গেলেন সেটের দিকে। শ্যামা যুবতীকে নিয়ে এগুলো।

গ্রীনরুমে প্রবেশ করে অবাক হলো যুবতী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো চারিদিকে।

শ্যামা একটা চেয়ার দেখিয়ে বললো—বসো।

যুবতী বসলো।

শ্যামা ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের দেহটাকে একবার নিখুঁতভাবে দেখে নিলো। তারপর বললো—কি বলে ডাকবো তোমায় বলো? পরিচালক সাহেব যে নাম দিয়েছেন ঐ নামে ডাকতে মানা করেছো, কিন্তু কেন বলতো?

ও নাম আমার কাছে ভাল লাগেনা।

তবে কি বলে ডাকবো? বলো লজ্জা কি? আমিও তো তোমার মতই একজন। যুবতী চেয়ারের হাতলে বসলো শ্যামা। দক্ষিণ হস্তের আংগুলে ওর কপালে থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে লাগলো সস্নেহে। বললো আবার —বলো কি বলে ডাকলে তুমি খুশি হবে?

আমার নাম ধরে ডেকো।

উঁ হু, নূরী নামটা তোমাকে পাল্টাতে হবে।

তাহলে যা খুশি তাই বলে ডেকো কিন্তু ঐ নামে নয়।

হেসে বললো শ্যামা—ঐ নাম মানে পরিচালক যে নাম দিয়েছেন?

হাঁ, ও নামে আমাকে ডেকো না।

বেশ, তাহলে আমিই একটা নাম রাখবো তোমার।

নূরী মাথা নীচু করে কথা বলে না কিছু।

শ্যামা ঠোটের উপর আংগুল রেখে ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে।

নূরী তখন তলিয়ে যায় নিজের চিন্তায়।----আজ বেশ কয়েকদিন হলো সে এই নতুন দেশে এসে হাজির হয়েছে। তাকে জোরপূর্বক ধরে এনেছে এরা। তাকে কোনো কষ্ট না দিয়ে যত্নই করেছে বরাবর। জীবনে সে যে সব দেখেনি—তা দেখেছে। যা সে কোনোদিন খায়নি, তাই খাচ্ছে। যা সে জীবনে পরেনি তাই সে এখন পরছে। কিন্তু এতো আদর যত্নে থেকেও তার

পাশে তাহলে সে এতোটুকু চিন্তিত বা দুঃখিত হতো না। কিন্তু কে জানে কোথায় সে। হয়তো এখনও সেই পর্বতমালার উপরে তার নাম ধরে ডেকে ফিরছে। খুঁজে ফিরছে বন হতে বনান্তরে। নূরীর গন্ড বেয়ে গড়িয়ে এলো দু'ফোঁটা অশ্রু।

শ্যামা হঠাৎ বলে উঠলো—পেয়েছি চমৎকার একটা নাম পেয়েছি তোমার জন্য। একি তুমি কাঁদছো?

নূরী হাতের পিঠে চোখের পানি মুছে ফেলে বলে—কই না তো।

হাঁ তুমি কাঁদছিলে। কিন্তু কেঁদে শুধু কষ্টই পাবে; ব্যথা কমবে না আরও বেশি হবে।

বলো শ্যামা কি নাম তুমি আমার জন্য পছন্দ করলে?

শশী বলে ডাকবো তোমায়।

শশী!

হাঁ, শশী মানে কি জানো?

মাথা নাড়লো নূরী—না, জানি না।

শশী—চন্দ্রের এক নাম।

হাসলো নূরী।

এমন সময় আসলাম আলী এলেন, ব্যস্তসমস্তভাবে বললেন—শ্যামা মেক আপ-ম্যান এলেই তোমরা তৈরী হয়ে নাও। আর শোনো।

শ্যামা বললো—তার আগে আমার একটা কথা শুনুন।

বলো? আসলাম আলী সিগারেট ধরালেন।

শ্যামা বললো—ওর নাম আমি নতুন করে দিয়েছি।

কি নাম?

শশী।

শশী?

হাঁ।

কেন—আমার দেওয়া নামটা বুঝি---

পছন্দ হয়নি ওর।

বেশ তো! শশী---শশীকলার মতই আত্মবিকাশ করবে চিত্রজগতের আকাশে। হাসলেন আসলাম আলী। তারপর বললেন—শ্যামা, সেটে সব প্রস্তুত শুধু তোমরা হাজির হলেই হয়।

এমন সময় মেক আপ-ম্যান গ্রীনরুমে প্রবেশ করেন।

আসলাম আলী তার সঙ্গে নূরীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নূরী মেক আপ-ম্যানের অর্থই বুঝে না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

আসলাম সাহেব মেক আপ ম্যানকে তার কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

শ্যামা নূরীকে বললো—এসো শশীরাণী।

নূরী উঠে এলো।

বড় আয়নাটার সম্মুখে বসতে বললো শ্যামা নূরীকে।

নূরী আদেশ পালন করলো শ্যামার।

মেক আপ ম্যান এসে দাঁড়ালেন নূরীর অতি নিকটে রং এর তুলি হাতে তুলে নিয়ে বাম হাতখানা রাখলেন নূরীর মাথায়।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো নূরী বিদ্যুৎগতিতে।

শ্যামা হেসে উঠলো খিলখিল করে। তারপর বললো—উনি তোমায় সাজিয়ে দেবেন বুঝলে?

নূরী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো—আমি কারো হাতে সাজতে চাই না। নিজেই ঢের পারি।

অনেক বুঝিয়েও নূরীকে শ্যামা রাজী করাতে পারলো না।

খবর পেয়ে শশব্যস্তে ছুটে এলেন আসলাম আলী, শ্যামার মুখে সব শুনে অবাক হলেন। নানাভাবে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত নূরীকে রাজি করিয়ে তবে ছাড়লেন।

পার্শ্ব-নায়িকার চরিত্রে রূপ দেবার জন্য নূরীকে একটি ভীলবালার বেশে সজ্জিত করা হলো। এ ড্রেসে ওকে মানালো অপরূপ। আসলাম আলী আনন্দে যেন ফেটে পড়লেন। এবার তার ছবি হিট না করে যাবে না। এখন অভিনয়ে সুনাম রাখলেই হয় মেয়েটা। আশায় বুক ভরে উঠলো তার ভরা নদীর মত।

❑

ষ্টুডিও সেটে লাইট ক্যামেরা সাউন্ড সব প্রস্তুত। শ্যামার সঙ্গে নূরী এসে দাঁড়ালো সেটে। একি! চারিদিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হলো নূরী। কাঁপছে তার

দেহটা বেতসপত্রের মত থরথর করে। বিস্ময়ে চোখ তার ছানাবড়া হয়ে উঠলো। শ্যামার আচল চেপে ধরলো ভয়কম্পিত হাতে।

প্রমাদ গুণলেন পরিচালক আসলাম আলী। এতো করে আজ ক'দিন থেকে অবিরত বুঝিয়েছেন তিনি মেয়েটাকে। তাছাড়াও শ্যামা তো সর্বক্ষণ ওর সঙ্গে রয়েছে ছায়ার মত। আজ নূরীর প্রথম শট্, সামান্য কিছু এ্যাকশন আছে। কিন্তু একি বিভ্রাট। সেটে আসবার পূর্বেও কি কম বোঝাতে হয়েছে তাকে। তার আগে মেক আপ নিতে গেছে কয়েক ঘন্টা।

বোম্বে-ষ্টুডিও ফ্লোর। তারিখ পাওয়াই মুস্কিল। একটার পর একটা ছবি সুটিং চলেছে একটানাভাবে। কোনোরকমে তারিখ করে নিয়েছেন আসলাম আলী দু'টি দিনের জন্য। শুধু কি তারিখ ফেলা ভার? আজকাল ফ্লোর পেতে হলেও চাই টাকা। ঘন্টায় হাজার দিতে হয় ষ্টুডিও কোম্পানীকে।

নূরীর ব্যাপারে আজ ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে অহেতুকভাবে। আবার শুরু হলো নূরীকে বোঝানোর পালা।

আসলাম আলী নিজে ম্যান্সক্রিপ্টা হাতে চরিত্রটা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

টেকিং শুরু হবে এবার।

ক্যামেরা রেডি করে নিয়ে দাঁড়িয়েছেন ক্যামেরাম্যান মধু বোস। ফ্লোরের বাইরে সাউন্ডভ্যানে ইঞ্জিনিয়ার সারথী বাবু প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন।

সেটে একটি কুটিরের দৃশ্য পড়েছে।

দাওয়ার খুটিতে ঠেশ দিয়ে বসে আছে শ্যামা নায়িকা রাজকুমারী জয়শ্রীদেবীর বেশে, এলায়িত রাশিকৃত চুল লুণ্ঠিত হচ্ছে ভূতলে। আঁচলখানা লুটায়িত দাওয়ার নীচে। গম্ভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন জয়শ্রী, গন্ড বেয়ে গড়িয়ে আসছে দু'ফোটা অশ্রু।

নূরী ভীলবালার বেশে দন্ডায়মান তার পাশে। খোঁপায় গলায় হাতে ফুলের মালা। খোঁপাটা বামে উঁচু করে বাঁধা ঠিক্ ভীল নারীদের মত। পায়ে মল।

ছবির নাম হলো "স্বয়ং বরা"

রাজকুমারী জয়শ্রী ভালবাসতো রাজকুমার বিশ্বজিৎকে। কিন্তু দুই রাজ্যের রাজার মধ্যে ছিলো বিরোধ। কাজেই দুই রাজ্যের রাজকুমারী আর রাজকুমারের মিলন কিছুতেই সম্ভব ছিলো না।

প্রেম অন্ধ।

জয়শ্রী বিশ্বজিৎকে না পেলে যেমন বাঁচবে না তেমনি রাজকুমার বিশ্বজিৎ জয়শ্রীকে না পেলে মৃত্যুবরণ করবে।

জয়শ্রীর বাবা রাজা মহন্ত সেন কন্যার জন্য স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন দেশে নিমন্ত্রণ পাঠালেন রাজকুমারগণকে আহ্বান জানিয়ে। পাশের রাজ্যের রাজকুমার বাদ পড়লো এ আমন্ত্রণে।

রাজকুমার বাদ পড়লেও সে গোপনে এলো রাজসভায় এক সন্ন্যাসী যুবক বেশে।

কেউ তাকে না চিনলেও চিনতে পারলো জয়শ্রী দেবী।

সখীগণ পরিবেষ্টিত হয়ে মালাহস্তে জয়শ্রী যখন রাজসভায় অসংখ্য রাজকুমারের মধ্যে তার প্রিয়জনকে অন্বেষণ করে ফিরছিলো তখন প্রতিটি রাজকুমার আশায়-উদ্দীপনায় গলাটা উঁচু করে বাড়িয়ে ধরছিলো। কিন্তু জয়শ্রীর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—সে সম্মুখে এগুচ্ছে।

সখীগণ পিছন থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছিলো।

হঠাৎ জয়শ্রী দেখতে পায় তার সামনে ভূতলে বসে এক সন্ন্যাসী যুবক। জয়শ্রী চিনতে পারে তাকে—হস্তস্থিত মালাটা পরিয়ে দেয় তার গলায়।

সঙ্গে সঙ্গে রাজসভার অন্যান্য রাজকুমার অমঙ্গলসূচক শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোষাবদ্ধ তরবারি উন্মোচন করে ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়ান রাজা মহন্ত সেন—কে ঐ সন্নাসী যুবক তাকে গ্রেফতার করো।

কিছু অদূরেই ছিলো রাজকুমার বিশ্বজিতের তেজবান অশ্ব, মুহূর্ত বিলম্ব না করে রাজকুমারী জয়শ্রী দেবীকে নিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসে উধাও হয়ে যায় হাওয়ার বেগে।

বিশ্বজিতের বাবা জানতে পেরে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন, পুত্রকে তিনি রাজপ্রাসাদে স্থান দেন না। কারণ শত্রুকন্যাকে তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না পুত্রবধু হিসাবে।

বিশ্বজিৎ এতে ভেঙ্গে পড়লো না, সে রাজকুমারী জয়শ্রী দেবীকে পেয়ে আত্মহারা। গহন বনে পর্ণকুটির তৈরী করে সেখানে ঘর বাঁধলো ওরা দু' জনে।

বিশ্বজিৎ সারাদিন বনে বনে কাঠ কাটে, সন্ধ্যায় হাটে বিক্রয় করে জয়শ্রীর জন্য নিয়ে আসে আলতা আর সিঁদুর। নিয়ে আসে ফলমূল আর দুধ। হাসে, খেলে, গান গায়—রাজকুমার এতেই খুশি।

কিন্ত জয়শ্রী ব্যথা- বেদনায় মুষড়ে পড়ে, স্বামীর কষ্ট তাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। আজ তার জন্যই রাজকুমার হয়ে গহন বনে কুড়ে ঘরে বাস করছে। একমুঠি অন্নের সংস্থানে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে সে তারই জন্য।

জয়শ্রী এই জঙ্গলে সখী হিসাবে পেয়েছে ভীলবালা ফুল্লরাকে সে প্রায়ই আসে, ওর কাছে বসে কথা বলে, কখনও বা বন থেকে ফল এনে খেতে দেয়, কখনও বা ফুল দিয়ে মালা গেঁথে পরিয়ে দেয় জয়শ্রীর গলায়।

আজ জয়শ্রীর সঙ্গে ফুল্লরার একটি দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

পরিচালক শ্যামা এবং নূরীকে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন, তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন—লাইট রেডি।

ক্যামেরা সাউন্ড.......

ফ্লোরের বাইরে সাউন্ডভ্যান থেকে শোনা গেলো সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের গলা—ও,কে!

সাইলেন্স প্লিজ! অল লাইটস্

নিস্তব্ধ চারিদিক।

প্রখর শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোগুলো যেন আগুন ছড়াচ্ছে।

ক্ল্যাপষ্টিকে সিকোয়েন্স সিন নাম্বার টেক-নাম্বার এবং বই -এর নাম চক পেন্সিলে লিখে এ্যাসিসটেন্ট ক্যামেরার সামনে ধরলো।

পরিচালক বলে উঠলেন —স্টার্ট ক্যামেরা।

এ্যাসিসটেন্ট বলে দ্রুত গলায় —স্বয়ংবরা। নাম্বার নাইনটি নাইন। টেক থ্রী!

ক্যামেরা চলতে শুরু করে।

কিন্ত ঐ মুহূর্তে নূরী শ্যামাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠে—না না আমি পারবো না, পারবো না এ সব! গলা থেকে ফুঁলের মালা ছিড়ে ফেলে। খোঁপা থেকে খুলে ফেলে ফুলের থোকা।

একি কান্ড, ইউনিট স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরিচালক 'কাট' বলবার আগেই ক্যামেরাম্যান ক্যামেরা বন্ধ করে ফেলেন।

এবার পরিচালক চীৎকার করে উঠেন—লাইটস্ অফ্, ফ্যান্স্....

পট পট করে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোগুলো নিভে যায়।

চার পাশে ফ্যানগুলো স্পীডে চলতে শুরু করে।

পরিচালক মাথায় হাত দিয়ে ধপ্ করে বসে পড়েন একটা চেয়ারে। সেটে সবাই স্তব্ধ-বিস্মিত হতবাক কারো মুখে কোনো কথা নেই। সহকারী দল এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

শ্যামা তখন রাগতভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে সে—শশী, এ তুমি কি করলে?

নূরী তখন তার সমস্ত মেকআপ নষ্ট করে ফেলেছে, বলে সে—চলো, তোমরা আমাকে শীগ্গির নিয়ে চলো বাসায় আর এক মুহূর্তও আমি এখানে থাকবো না।

শেষ পর্যন্ত নূরীর কথাই শুনতে বাধ্য হলেন পরিচালক।

❑

ললাটে একটি কোমল হস্তের স্পর্শ অনুভব করে চোখ মেললো বনহুর—কেশব, এতো রাত—তুমি ঘুমাও নি?

কেশবের ডিউটি আছে, সে ইঞ্জিন-কক্ষে।

আপনি! আপনি এখানে মেম সাহেব?

কেমন আছো আলম এখন ?

অনেক ভাল। কিন্তু আপনি এখানে......

কেন, দোষ কি তাতে?

মেম সাহেব, নিকৃষ্ট এক নাবিকের ক্যাবিনে আপনি— সত্যি কল্পনাও করতে পারি না।

আলম, নাবিক বলে তুমি নিকৃষ্ট কে বললো? কেউ না জানুক আমি জানি, নাবিক হলেও তুমি অনেক মহৎ নীহারের হাতখানা তখনো বনহুরের ললাটে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হচ্ছিলো।

পূর্ণ দু'সপ্তাহ পর আরোগ্য লাভ করেছে বনহুর। এখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। দেহের কয়েকটা ক্ষতে তখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা রয়েছে। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টায় নাবিক আলমের চিকিৎসা করেছেন—আজও করছেন। শুধু আবু সাঈদের অনুরোধেই নয়, ডাক্তার আলমকে কখন ভালবেসে ফেলেছিলেন গভীরভাবে।

দিনরাত পরিশ্রম করেছেন ডাক্তার আলমের জন্য। নানা রকম ঔষধ-ইনজেকশন চালিয়েছে, পথ্যা-পথ্যের দিকে লক্ষ্য দিয়েছেন তিনি ভালভাবে।

নীহার নিজ হাতে আলমের সেবা করেছে, ঔষধ খাওয়ানো থেকে মাথা ধোয়ানোটা, পর্যন্ত।

আবু সাঈদ মানা করেননি বা বিরক্ত হননি কোনো সময়। বরং এতে তিনি খুশিই হয়েছেন। ধনবান ঐশ্বর্যশালী লোক হলেও তাঁর অন্তর ছিলো অত্যন্ত সচ্ছ, স্বাভাবিক। কোনো রকম অহঙ্কার বোধ ছিলো না তাঁর মধ্যে! তাই নীহারের নিরহঙ্কার স্বভাবে তিনি আনন্দই পেতেন।

অনেক রাতেও পিতার সঙ্গে কতদিন খোঁজ নিতে আসতো নীহার। আজও এসেছে—কিন্তু আবু সাঈদ তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন।

বনহুর নীহারের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো, দেখলো ওর চোখ দুটো। কেমন মায়াময় ছলছল দুটি চোখ। শুভ্র ললাটে কয়েকগুচ্ছ কোকড়ানো কালো চুল। চিবুকের পাশে একটি তিল চিহ্ন। ক্যাবিনের স্বল্প আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীহারের চিবুকে তিলটা। বড় সুন্দর লাগছে ওকে—বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নীহার দৃষ্টি ফিরাতেই বনহুরের দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচুখি হয়।

বনহুর বলে—মেম সাহেব এবার আপনি যান।

আমি তোমার পাশে থাকলে খারাপ লাগে বুঝি?

না। ভাল লাগে।

তবে আমি এলেই তুমি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করো?

বনহুরের মুখে একটা ব্যথা করুণ হাসি ফুটে উঠে, বলে—আপনি কেমন করে জানলেন ঐ সময় আমি অস্বস্তি বোধ করি?

আমি এলেই তুমি আমাকে চলে যাবার জন্য বারবার ইংগিৎপূর্ণ কথা বলো।

মেম সাহেব!

না, আমাকে আর মেম সাহেব বলে ডাকবে না।

সে কি!

আমি জানি তুমি নাবিক নও।

চমকে উঠে বনহুর—আপনি কি বলছেন?

কেশবের মুখে শুনেছি, তুমি নাকি সাধারণ লোক নও!

বনহুর শয্যায় উঠে বসতে যায়। মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠে—ভাবে বনহুর, তবে কি কেশব সব কথা নীহারের কাছে বলে দিয়েছে....

নীহার শুইয়ে দেয় পুনরায় ওকে, বলে সে—আমি সব শুনেছি, কিন্তু কেন নিজকে গোপন করে নাবিক বেশে পরিচিত হয়েছো আলম?

মেম সাহেব, আমি অতি সাধারণ, তবে বড় খামখেয়ালী কিনা, তাই বুঝি কেশব আপনাকে যা'তা বলেছে।

নিজকে লুকোতে চাইলেই লুকোনো যায় না আলম। তুমি ঘুমাও, আমি চললাম।

বনহুর কোনো জবাব দিলো না।

নীহার কম্বলখানা ভালভাবে বনহুরের দেহে টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর পাশ ফিরে শুলো।

কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো, কেশব কি তাহলে ছেলেমানুষের মত সব কথা প্রকাশ করে দিয়েছে নীহারের কাছে।

সমস্ত রাত কেমন যেন ছটফট করে কাটাতে লাগলো বনহুর। কেবলি নীহারের শেষ কথাটা মনে আঁচড় কেটে চললো, নিজকে লুকোতে চাইলেই লুকোনো যায় না আলম।

তবে কি কেশব সব ব্যক্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয়ই তাই হবে।

পরদিন কেশবকে ডেকে বললো বনহুর—কেশব শোনো।

কেশব খুশি হয়ে এলো বনহুরের পাশে, শিয়রে বসলো—বাবু কিছু বলবেন?

হাঁ।

বলুন বাবু?

কেশব, আমি তোমাদের বিশ্বাস করি, তোমাকে আমি নিজের ভাই-এর মত মনে করি। আর তুমি আমার সম্বন্ধে সব কথা বলে দিয়েছো মালিকের কন্যা নীহারের কাছে?

অবাক হয়ে তাকালো কেশব, বললো—আপনি কি বলছেন বাবু? আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কেশব, তুমি নীহারের কাছে আমার আসল পরিচয় ব্যক্ত করেছো?

না তো বাবু।

হাঁ, তুমি আমার পরিচয় দিয়েছো ওর কাছে? সব কিছু বলেছে?

মাফ্ করবেন বাবু, আমি নিজে কিছু বলিনি। মেম সাহেব একদিন আমাকে ডেকে বললেন, কেশব, তোমার বাবুকে দেখলে কিন্তু নাবিক বলে মনে হয় না।

তুমি কি বললে?

আমি বললাম—বাবু আসলেই নাবিক নন, তিনি মস্ত বড়লোকের ছেলে।

হুঁ, শুধু তাই বলেছো?

হাঁ বাবু, আমি শপথ করে বলছি শুধু তাই বলেছি।

বনহুর নিশ্চিত হয়ে চোখ মুদলো, একটা চাপ যেন নেমে গেলো তার বুক থেকে।

❑

বনহুর প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

কাজে যোগ দিতে চাইলেও আবু সাঈদ তাকে কাজ করতে দেননি, বলেছেন আর কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে। অগত্যা বনহুর শুয়ে-বসেই কাটাচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের জাহাজ দুটো বন্দর অতিক্রম করেছে। লাইলিয়াস বন্দর আর হিংলী বন্দর—এখানে দু'চারদিন নোঙ্গরও করেছে তাদের জাহাজ।

ক্যাপ্টেন জানিয়েছেন আর দু'দিন পর তাদের জাহাজ ইরুইয়ায় পৌঁছবে। ইরুইয়ায় একদিন অপেক্ষা করবার পর জাহাজ রওয়ানা দেবে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে।

ইরুইয়ায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে নেবেন আবু সাঈদ—চাউল, ময়দা, মুরুগী, শুকনো দুধ আর ফলমূল। এসব ছাড়াও অনেক জিনিস ক্রয় করতে হবে।

আবু সাঈদ কন্যাসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির একটি লিষ্ট তৈরী করে ফেললেন। অন্য সময় হলে এক্ষণে নাসের থাকতো তাদের পাশে। পর পর কয়েকটা ঘটনার পর আবু সাঈদের মন যেন নাসেরের উপর বিরূপ হয়ে পড়েছিলো। কাজেই তিনি কতকটা ইচ্ছে করেই ওকে এড়িয়ে চলছেন আজকাল।

নীহার সেদিনের নাসেরের ঘটনাটা পিতার কাছে সচ্ছভাবে বলতে না পারলেও যতটুকু ব্যক্ত করেছিলো, তাতেই আবু সাঈদের কাছে নাসেরের আসল রূপ উদঘাটিত হয়ে পড়েছিলো। শুধু অমানুষই নয় সে, নষ্ট চরিত্রহীন এক কুৎসিত যুবক।

তার এতোদিনের ইচ্ছার পাদমূলে কুঠারাঘাত হয়েছিলো। দূষিত আবর্জনার মত মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন আবু সাঈদ নাসেরকে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেই ওকে পর্যটক দল থেকে বিতাড়িত করবেন—এ কথাও তিনি মনে মনে স্থির করে ফেলে ছিলেন। নীহারকেও তিনি বলে দিয়েছিলেন ওর সংস্পর্শে যেন আর না যায় সে।

শুধু আবু সাঈদই নন, নীহারও আজকাল নাসেরকে দেখে তুচ্ছ জ্ঞান করে পরিহার করে চলে।

আবু সাঈদের অবহেলার চেয়ে নীহারের অবজ্ঞাভরা ভাব দুষ্ট নাসেরকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে। নানা ব্যাপারে বেশ কয়েকবার বিফল মনোরথ হয়ে খর্গহস্ত হয়ে উঠে সে। সদা-সর্বদা চলে গোপন পরামর্শ জলিল, শুম্ভু আর জম্বুকে নিয়ে।

নাবিক ফারুক আলীকেও দলে টেনে নেয়; ওকে দিয়ে পুনরায় যদি কোনো পথ পরিস্কার করা যায়!

আসলে ফারুক আলী মন্দ লোক নয়। সে জীবনের ভয়ে মুখ বুঁজে থাকে, এবং নাসেরের দলবলের সঙ্গে যোগ দিয়ে চলে। মকবুলের মৃত্যুরহস্য তার কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে ঐদিন যেদিন নাসের বলেছিলো—আমার কথায় আপত্তি জানালে তোমাকেও মকবুলের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

দেশে ফারুক আলীর বৌ ছেলেমেয়ে আছে, সংসার আছে। সবাই মুখ চেয়ে আছে ওর। ফারুক আলী অর্থ নিয়ে দেশে ফিরবে—কত আশা, বাসনা, আর কিনা সে মৃত্যুবরণ করবে! মরতে রাজী নয় সে, জীবনরক্ষার্থে তাকে দু'চারটা-কুকর্ম করতে হয় তাই করবে।

নাসের তার অনুচরদের নিয়ে সদা গোপন বৈঠক করলেও সহজে সে কিছু করে উঠতে পারছিলো না। বিশেষ করে জাহাজের সবাই সতর্ক হয়ে গিয়েছিলো, মকবুলের মৃত্যু, নাবিক আলমকে হত্যার ষড়যন্ত্র ভাবিয়ে তুলেছিলো প্রতিটি যাত্রীকে।

আবু সাঈদের সঙ্গী-সাথী পর্যটকগণও আতঙ্কিত হয়েছেন—আলমের মত একজন কর্মপরায়ণ উন্নতমনা নাবিককেও যখন প্রাণনাশ করার চেষ্টা হয়েছিলো, তখন বিশ্বাস কি।

নীহার নিজের চেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত ছিলো নাবিক আলমের জন্য। পিতাকে বলে সে তার জন্য আরও কিছুদিন ছুটি মঞ্জুর করে নিয়েছিলো। উপস্থিত ওকে বিশ্রাম নিতে হবে।

হেড নাবিকের মৃত্যুর পর ঐ পদে ছিলো আলম।

আলম এক্সিডেন্ট হবার পর হেড নাবিকের কাজ করে চলেছে নাবিক ফারুক আলী। যে ফারুক আলীকে নাসের হাতের মুঠায় ভয়ে নিয়েছে।

নীহার পিতার অনুমতি নিয়ে আলমকে দেখাশোনার ভার নিয়েছিলো, কাজেই সে সময়-অসময় সর্বক্ষণ যেতো নীচের ডেকে নাবিক আলমের ক্যাবিনে।

স্বল্প পাওয়ারের আলোতে ছোট ধোয়াটে ক্যাবিনটার মধ্যে এসে দাঁড়াতো নীহার। তাকিয়ে দেখতো অসুস্থ আলমের ঘুমন্ত মুখ। করুণ ব্যথাভরা লাগতো ওকে। আহা বেচারী, কেউ নেই ওর। নীহারের গন্ড বেয়ে দু'ফোঁটা পানি ঝরে পড়তো।

নীহার আলগোছে কম্বলটা ঠিক করে দিতো আলমের দেহে।

কোনোদিন শিয়রে বসে কপালে হাত রাখতো।

ঔষধ খাওয়ানোর সময় হলে কতদিন খাইয়ে দিতো।

আলমের তখন হুশ ছিলো না, সে তখন ক্ষতের ব্যাথায় কাতর।

যখন তার হুশ হলো, তখন নীহারকে তার অপরিচ্ছন্ন ক্যাবিনে দেখে অবাক হলো—মেম সাহেব এসেছেন তার রোগশয্যার পাশে!

বনহুর একদিন বলেই ফেলেছিলো—মেম সাহেব, আপনি কষ্ট করছেন আমার জন্য!

হেসে বলেছিলো নীহার—আমার এ কষ্ট দিয়ে তোমার কষ্ট যদি লাঘব করতে পারতাম, তার চেয়ে আনন্দ বুঝি আমার আর কিছু ছিলো না।

বনহুর সেদিন এক অভূতপূর্ব খুশিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো, বলেছিলো—মেম সাহেব, আপনি আমাকে এতো আর বলতে পারেনি সে।

কেশব এসে পড়েছিলো কক্ষের মধ্যে।

বনহুর চোখ মুদে ছিলো তখন অনিচ্ছাসত্ত্বে নীহারের দিকে চাইতে পারেনি সে।

নীহার বনহুরকে ঔষধ খাইয়ে চলে গিয়েছিলো সেদিন, শোনা হয়নি তার—কি বলতে চেয়েছিলো আলম।

❑

বনহুর ক্যাবিনের বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে তাকিয়েছিলো পাশের ছোট শার্সী দিয়ে কলকল ছলছল জল রাশির দিকে।

ক্যাবিনে বা আশেপাশে কেউ নেই। কেশব কাজে গেছে। বনহুরকে বড় একা লাগছে আজ। এখন তো সে অসুস্থ নয়। প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ বলা বলে।

কাঁধে এবং হাতে দু'এক জায়গায় ছোট্ট পট্টি রয়েছে এখনও। তবে ভয় নেই আর, বিপদ কেটে গেছে পূর্ণভাবে। বনহুর ভেবে চলেছে তার বিগত জীবনের কথা।

ঠিক সেই সময় লঘু পদশব্দ শুনতে পেলো বনহুর।

হাল্‌কা হিলের খুটখাট শব্দ।

আজ এ ক'দিনে এই শব্দটার সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে গেছে সে। নীহারের জুতোর শব্দ বুঝতে পেরে বনহুর যেমন ছিলো তেমনি থাকে।

এ শব্দটা বড় ভাল লাগে দস্যু বনহুরের কাছে। মায়া-মমতা আর প্রীতির ছোয়া যেন লেগে আছে এ শব্দের সঙ্গে; স্নিগ্ধ হিমেল হাওয়ার মত মিষ্ট এ শব্দটা মনে হয় বনহুরের কাছে।

সুমিষ্ট কণ্ঠের প্রতিধ্বনি জাগে—ঔষধ খেয়েছো আলম?

সোজা হয়ে বসে বনহুর—মেম সাহেব আপনি!

আবার তুমি আমাকে মেম সাহেব বলছো? মেম সাহেব বললে আমি কিন্তু বড্ড রাগ করবো।

আমি গরীব বেচারী কি বলে ডাকতে পারি বলুন?

নাম ধরে ডেকো।

নাম! আপনার নাম ধরবো আমি?

দোষ কি আমার নাম ধরতে?

কি যে বলেন, আমরা চাকর-বাকর নাবিক মানুষ......

আবার নেকামি? আমি তো বলেছি তোমার সব খোঁজ জানি?

কেশব যা বলছে মোটেই সত্য নয়।

কেশব মিথ্যা বললেও আমার চোখ তো মিথ্যা নয়। আমার দৃষ্টি বলছে—তুমি সাধারণ মানুষ নও।

নীহার! হঠাৎ বনহুরের মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে এলো।

বনহুরের মুখে নামটা শুনে নীহারের চোখ দুটো আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলো। বসে পড়লো সে বনহুরের বেডের পাশে। —হাঁ, তুমি আজ থেকে আমাকে নাম ধরে ডাকবে।

তা হয় না মেম সাহেব। আপনি মনিব-কন্যা আর আমি.....

আলম!

বলুন?

তোমার যদি এতো অসুবিধা মনে হয় তবে সবার আড়ালে তুমি আমায় নাম ধরে ডাকবে? নীহার বনহুরের মুখের দিকে ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকালো।

বনহুর শয্যায় দেহটা এলিয়ে দিলো, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো—যদি খুশি হন আপনি তবে তাই ডাকবো।

কিন্তু আপনি নয় তুমি বলতে হবে।

আমাকে এতোটা প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না মেম সাহেব।

কেন?

সে জবাব আমি দিতে চাই না।

ঔষধ খেয়েছো?

আর কত ঔষধ খাবো? এখন তো আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছি।

শরীর তো মোটেই সারেনি। আরও এক সপ্তাহ তোমাকে বিশ্রাম নিতে হবে।

আমি যে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বো মেম সাহেব?

বেশ, আমি তোমাকে মুক্ত হাওয়ায় নিয়ে যাবো। নাও, ঔষধটা খেয়ে নাও। শিশি থেকে ছোট্ট গেলাসটায় ঔষধ ঢেলে বনহুরের মুখের কাছে এগিয়ে ধরে।

বনহুর হাত বাড়ায়—দিন।

নীহারের হাত থেকে ঔষধের ছোট্ট গেলাসটা নিতে গিয়ে বনহুরের হাতখানা লাগে নীহারের হাতে। অভূতপূর্ব এক শিহরণ বয়ে যায় নীহারের সমস্ত দেহে, হাতখানা চট্ করে সরিয়ে নিতে পারে না ওর হাতের তলা থেকে।

বনহুর বলে—নীহার, সত্যি তোমার অন্তরের অনুভূতি বরফের চেয়েও ঠান্ডা। গভীর তোমার প্রীতিবোধ। সামান্য নাবিক জেনেও তুমি আমাকে ঘৃণা করোনি কোনোদিন। তোমার সচ্ছ হৃদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বনহুর নীহারের হাত থেকে ঔষধের ছোট্ট গেলাসটা নিয়ে ঔষধ পান করে।

নীহার তখন অপলক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে। একজন সাধারণ নাবিকের মুখে এ কথা তাকে যেন সন্বিৎ হারা করে ফেললো। বুঝতে পারলো, কেশবের কথা শুধু সত্যই নয়, একেবারে খাঁটি বিশ্বাসযোগ্য। বললো নীহার—আলম, তুমি নাবিক সেজে কেন নিজেকে এভাবে গোপন রেখেছো?

হাসলো বনহুর—কাজ তো কোনোদিন ছোট হয় না নীহার। যে কোন কাজের মাধ্যমেই মানুষ মহত্বের পরিচয় দিতে পারে।

আলম, তোমাকে যত দেখি তত আরও দেখতে ইচ্ছা করে। যত ভাবি তোমার কথা, ততই আরও ভাবতে চায় মন। তোমার সান্নিধ্য আমাকে আত্মবিস্মৃতির পথে টেনে নিয়ে যায়.......

নীহার!

আলম, বলো তুমি কি চাও আমার কাছে?

বনহুর স্থির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলো মুক্ত গবাক্ষে। সীমাহীন জলরাশির উচ্ছলতার দিকে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিলো। নীহারের আবেগভরা কথাগুলো। ফিরে তাকালো বনহুর এবার নীহারের শেষ কথাটা শুনে। দেখলো ওর চোখেমুখে এক অপূর্ব ভাবের উন্মেষ।

বনহুরের বুকের মধ্যে একটা আলোড়ন শুরু হলো। দেহের মাংস পেশীগুলো যেন সজাগ হয়ে উঠলো ক্রমান্বয়ে। সোজা হয়ে বসলো বনহুর।

নীহার ঠিক তার অর্ধ হাত দূরে, তারই শয্যায় বসে রয়েছে। নীল মায়াভরা দুটি চোখে মোহময় চাহনি। গোলাপের পাপড়ির মত দুটি আঁখিপল্লব। ওষ্ঠদ্বয় অর্দ্ধস্ফীত। কুঞ্চিত একরাশি চুল বিণূনী করে ঝুলানো রয়েছে পিঠে ঠিক একটি সাপের মত।

বনহুর নিশ্বাস নিলো। একটা সুগন্ধ প্রবেশ করলো তার নাসিকারন্ধ্রে। নীহারের দেহের মিষ্ট গন্ধ এটা জানে বনহুর। কারণ আরও অনেকদিন এ গন্ধ বনহুরের নাকে প্রবেশ করেছে তার অসুস্থকালে। অতি পরিচিত এ গন্ধ। নীহার শিয়রে এসে দাঁড়ালেই বনহুর টের পেতো নীহার এসেছে, কারণ নীহারের দেহের সুগন্ধ এটা।

অবশ্য নীহার ইচ্ছে করে সুগন্ধ ব্যবহার করে তবে এ ক্যাবিনে আসতো না। ধনবান দুহিতা মূল্যবান প্রসাধন ব্যবহার করতো—তাই এ গন্ধ। বনহুর তাই ঐ গন্ধের সঙ্গে বিশেষ করে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলো।

আজ নীহারের দেহের মিষ্ট সুবাস বনহুরের আনমনা নাককে চঞ্চল করে তোলে। নীহারের হাতখানার উপর আস্তে তার হাতখানা রাখে।

নীহার শিউরে উঠলেও চম্‌কায় না। বুকটা টিপ্ টিপ্ করতে থাকে। একটা অনুভূতি দোলা জাগায় সমস্ত দেহ আর মনে। মাথা নত করে নেয় নীহার। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না যেন আর সে।

সেদিন নাসেরের ক্ষুধিত শার্দ্দুলের মত ক্ষুব্ধ আক্রমণে নীহার ক্ষিপ্তের ন্যায় হয়ে উঠেছিলো। নিজকে বাঁচানোর জন্য সে চালিয়েছিলো ভীষণ সংগ্রাম। মৃত্যুকেও সে ঐ মুহূর্তে জয় করে নিতো। কি কঠিনভাবে যুদ্ধই না সে করেছিলো নাসেরের সঙ্গে নিজকে রক্ষা করার জন্য।

নীহার মরিয়া হয়ে উঠেছিলো নাসেরের কবল থেকে ইজ্জৎ বাঁচানোর জন্য। সেই মুহূর্তে সে ওকে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করতো না। নাসেরের দেহের মাংস ছিড়ে ফেলেছিলো নীহার দাঁত দিয়ে সেদিন।

নীহার জানতো নাসের তাকে ভালবাসে, জানতো তার পিতা আবু সাঈদ ওর সঙ্গে বিয়েও দেবেন। নাসের অসুন্দর যুবক নয় বলিষ্ঠ সুশ্রী সুপুরষ। তবু নীহার ওকে ঘৃণা করতো, কারণ চরিত্রহীন কুৎসিতমনা পুরুষকে কোন সতচরিত্রা নারী প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

নীহার সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা আদর্শবতী কন্যা। নাসের তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেও সে কোনো সময় নাসেরের প্রতারণায় আত্মহুতি দিতো না। যতদূর সম্ভব নিজেকে কুচরিত্রের শ্যেন দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতো। নাসেরের সংস্পর্শকে সে ঘৃণা করতো চরম আকারে।

নাসের নীহারের কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসাবে প্রথম থেকেই অবহেলা পেয়ে এসেছে। যখন আলম আসেনি এ জাহাজে, তখনও ওকে কোনো সময় প্রশ্রয় দেয়নি, বা প্রীতির চোখে দেখেনি। নাসেরের মত একজন সুদর্শন বলিষ্ঠ তেজোদ্দীপ্ত যুবক পাশে থাকা সত্ত্বেও নীহারের মনে ছিলো অতৃপ্ত বাসনা—যে আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারবে না নাসের।

নীহার যেমন ধীরস্থিরা মেয়ে, চরিত্র যেমন ফুলের মত সচ্ছ-সুন্দর, তেমনি একজনের সন্ধানে সে অহরহ প্রতীক্ষা করতো শান্ত মন নিয়ে খুজতো ফুলের সুবাস।

নাবিক আলমের আগমনে নীহার সন্ধান পেয়েছিলো তার কামনার মানুষটির। প্রথম নজরেই ওকে ভাল লেগেছিলো। সুন্দর চেহারা তখন ঢাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের আড়ালে। কাজেই নাবিকের রূপলাবণ্য আকৃষ্ট করেনি তাকে। নীহার আকৃষ্ট হয়েছিলো আলমের পৌরুষোচিত কণ্ঠস্বরে, তার দীপ্ত উজ্জল চোখ দুটির চাহনি অভিভূত করেছিলো তাকে।

কিন্তু জানে না নীহার—যাকে খুঁজে পেয়েছে তাকে কোনদিন সে নিজের করে পাবে না। ধূমকেতুর মত এসেছে, আবার হারিয়ে যাবে তার জীবনপাতার অন্তরালে।

নীহার বনহুরের হাতের মধ্যে হাত রেখে নতমুখে বসে থাকে। সরিয়ে নিতে পারে না সে হাতখানা। বনহুর হাতখানা তুলে নেয় হাতের মুঠোয়। বাম হস্তের মধ্যে নীহারের হাতখানা নিয়ে দক্ষিণ হস্ত বুলোতে থাকে ওর হাতের উপর। এমনি একটি কোমল নরম হাত ক'দিন আগেও সে হাতের মুঠোয় রেখেছিলো, কিন্তু কালচক্রে আজ সে হাত কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে। হিংস্র জন্তুর গহ্বরে চলে গেছে, না কোনো জংলীদলের কবলে ধরা পড়েছে—কে বলবে তাকে তার সন্ধান বনহুরের গন্ড বেয়ে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

বনহুর বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে—নীহার!

চোখ তুলে নীহার, আলমের চোখে পানি দেখে চমকে উঠে—আলম তুমি কাঁদছো?

একটা জমাট ব্যথা যেন বেরিয়ে আসে বনহুরের বুক চীরে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে—নীহার, আমি বড় দুঃখী! বড় একা।

আলম, আমি তোমাকে বলছি, যা চাও আমি তোমায় তাই দেবো! আর আমি যদি থাকি তোমার পাশে?

নীহার!

আলম, আমার অতৃপ্ত হৃদয় তোমায় খুঁজে পেয়েছে; আমি তোমায় কোথাও যেতে দেবো না আর।

একটা করুণ বিষন্ন হাসির স্মিত রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটে। নীহারের হাতখানা সেই মুহূর্তে খসে পড়লো বনহুরের হাতের মুঠা থেকে।

নীহার অবাক হয়ে তাকালো।

জীবনে সে বহু পুরুষ দেখেছে, যদিও সে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়নি। কিন্তু যতটুকু পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে সবাই তাকে কাছে পেলেই কিসের যেন একটা লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছে। সুযোগ পেলেই শুনিয়েছে প্রেমবাণী। আরও কাছে পাবার জন্য তারা যেন পশুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

নীহারের চোখেমুখে এক মধুময় দীপ্তভাব ফুটে উঠে। নিজের আঁচলে বনহুরের চোখের গড়িয়ে পড়া দু'ফোটা পানি মুছিয়ে দেয়।

বনহুর পুনরায় নীহারের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বাষ্প ভরা গলায় বলে—নীহার, চোখের অশ্রু যেমন করে মুছিয়ে দিলে, পারবে অমনি করে আমার মন থেকে সব ব্যথা-বেদনা মুছে ফেলতে?

পারবো। তোমার সব বেদনা আমি মুছে ফেলতে পারবো। কথাটা বলে নীহার হঠাৎ বনহুরের বুকে মাথা রাখে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করে নাসের, দক্ষিণ হস্তে তার উদ্যত পিস্তল।

পরবর্তী বই

ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই